ত্রৈমাসিক

বর্ষ : ৫ । সংখ্যা : ১৯ । জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৯

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ৫ সংখ্যা : ১৯

প্রকাশনায় : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০০৯

যোগাযোগ : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
৫৫/বি পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
সুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৭১৬০৫২৭
মোবাইল : ০১৭১৭ ২২০৪৯৮, ০১৯১৭-১৯১৩৯৩, ০১৯১৬-৫৯৪০৭৯
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
Web : www.ilrcbd.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
MSA ৮৮৭২
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
পুরানা পল্টন শাখা, ঢাকা।

প্রচ্ছদ : মোমিন উদ্দীন খালেদ

কম্পোজ : মডার্ন কম্পিউটার প্রিন্টার্স, ১৯৫ ফকিরাপুল (৩য় তলা), (১ম গলি) ঢাকা।

দাম : ৪০ টাকা US $ 3

Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam. General Secretary. Islamic Law Research Centre and Legal Aid Bangladesh. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price Tk. 40 US $ 3.

সূচিপত্র

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই- সেপ্টেম্বর ঃ ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ১৯ পৃষ্ঠা ৪-৮

<u>সম্পাদকীয়</u>

ইসলামের সম্ভাবনা এবং উম্মাতের বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব

অতীতে যারা বুদ্ধির চর্চা করেছেন তারা আল্লাহর দেয়া একটা বিধানের আওতায় অবস্থান করেছেন। মানুষের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস এ কথাই বলে। হাজার হাজার বছরে দুনিয়ার দেশে দেশে অসংখ্য জাতির ও সভ্যতার উত্থান পতন হয়েছে। এশিয়ায় আফ্রিকায় ইউরোপে এরা বিশাল সভ্যতা গড়ে তুলেছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটিয়েছে। রাজনীতি চর্চা ও রাষ্ট্র পরিচালনায় এদের পারদর্শিতা সভ্যতার রূপান্তর ঘটিয়েছে। এ সবই মানুষের বুদ্ধি চর্চার ফল। এক্ষেত্রে দার্শনিকের দর্শনচর্চা নবীদের নবুওয়তকে অতিক্রম করতে পারেনি। আজকের যুগে বুদ্ধিচর্চার যে প্রান্তে আমরা এসে পৌঁছেছি সেখানে এসেও আমরা এ সত্যটি পুরোপুরি উপলব্ধি করছি। বিগত শতকে পৃথিবীর একটা অংশে আল্লাহর বিধান অস্বীকার করার একটা দুঃসাহস আমরা দেখেছি। কিন্তু সত্তর বছরের মধ্যে তাদের চূড়ান্ত পতন আবার সেই চিরন্তন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, "সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা অপসারিত হয়েছে। আর মিথ্যা অপসারিত হয়েই থাকে।"

আধুনিক যুগে আল্লাহর বিধানের আওতায় বুদ্ধিচর্চাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে সক্ষম একমাত্র ইসলাম। ইসলাম শুরু থেকেই একদিকে যেমন আল্লাহর বিধানকে অবিকৃত রাখার চেষ্টা চালিয়ে আসছে তেমনি অন্যদিকে বুদ্ধিচর্চাকেও এই বিধানের আওতায় রাখার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছে। যার ফলে শুরু থেকে নিয়ে এক হাজার বছর পর্যন্ত ইসলামী চিন্তা বিশ্ব শাসন করেছে। এটা কিভাবে সম্ভব হয়েছে? ইসলামে বুদ্ধিচর্চা গোড়া থেকেই আল্লাহর বিধানের আওতাধীন হয়েছে। আল্লাহর নবী নিজেই ছিলেন এই বুদ্ধিচর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে। কুরআন নিজেই যেখানে চিন্তা করার, ভেবে দেখার এবং গভীর অভিনিবেশ সহকারে বিচার বিবেচনা করার আহবান জানিয়েছে সেখানে আল্লাহর নবী তাঁর সাহাবাগণকে উৎসাহ যুগিয়েছেন আগামী দিনে পথ চলার ক্ষেত্রে উদ্ভূত নতুন নতুন সমস্যা সমাধানের কৌশল উদ্ভাবনে। আল্লাহর বিধানের আওতায় বুদ্ধিকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জনে মু'আযকে রা. জিজ্ঞেস করলেন, ইয়ামনের মতো একটা নতুন দেশে এবং একটা অগ্রসরমান সুসভ্য জাতির এলাকায় তোমাকে শাসক হিসেবে পাঠানো হচ্ছে; তারা নতুন কোনো সমস্যা নিয়ে আসলে কিভাবে তার সমাধান করবে?

জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রসূল, প্রথমে কুরআনে খুঁজে দেখবো তার সমাধান। কুরআনে না পেলে আপনার হাদীস ও সুন্নাতে তার সমাধান দেখবো। সেখানে না পেলে আমার নিজস্ব চিন্তার ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করবো (আজতাহিদু বিরায়ী)।

আল্লাহর রসূল মু'আযকে সমর্থন দিলেন। চিন্তারা এগিয়ে চললো অহী ও নবুওয়তের ছত্রছায়ায়। প্রথমে কুরআন, তারপর হাদীস, তারপর আমার চিন্তা, অর্থাৎ আমার চিন্তা কুরআন ও হাদীসের পিছনে, তার আগে নয়। এক'শো দু'শো তিনশো বছর পর্যন্ত স্বাধীন চিন্তায় কোনো ক্লান্তি দেখা গেলোনা। নবী, সাহাবা, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের যুগ শেষ হয়ে গেলো। নতুন নতুন দেশ ও ভূখন্ড বিজিত হলো। নতুন সভ্যতা ও নতুন জাতিরা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিলো। নতুন নতুন সমস্যা ও জটিলতর সমস্যার সমাধান করলো মুসলমানরা আল্লাহর বিধানের আওতায় নবীর অনুসৃত পথে।

সৃষ্টি এবং কর্ম এই দুই নিয়ে আল্লাহর দুনিয়া গঠিত। সৃষ্টি আল্লাহ্ করেছেন। সৃষ্টি যেসব কর্ম করে তার প্রত্যেকটার পেছনে যেসব কার্যকারণ থাকে তাও আল্লাহর সৃষ্টি। বর্তমানের নতুন সমস্যার অতীতের ব্যবস্থায় যার কোনো সমাধান বিধৃত নেই তার পেছনে যে কার্যকারণ পাওয়া যায় অতীতের অনুরূপ বা সমধর্মী কাজের পেছনে যে কার্যকারণ ছিল তার সাথে যদি এর সামঞ্জস্য পাওয়া যায় তাহলে অতীতের সেই কাজের হুকুম বর্তমানের সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। একে বলা হয় কিয়াস ও ইজতিহাদ। মুসলমানরা নিছক বুদ্ধির পায়রবি না করে এই কিয়াস ও ইজতিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর বিধানের আওতায় তাকে ব্যবহার করেছে। তিনশো বছর পর্যন্ত এ ব্যবস্থায় কোনো কমতি দেখা দেয়নি। কুরআন ও সুন্নাহ এবং একই সঙ্গে জাগতিক জ্ঞান বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা হয়েছে এবং মুসলমানরা আল্লাহর বিধানের আলোকে সাহসের সাথে জীবন সমস্যার সমাধান করেছে। পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে গেছে সঠিক পথে। তারপর ধীরে ধীরে অবসাদ নেমে আসতে থেকেছে।

চতুর্থ হিজরী শতকের পূর্বে মুসলমানরা নির্দিষ্ট কোনো এক ব্যক্তির রায় ও অভিমত মেনে চলার ব্যাপারে একমত হয়নি। হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে মুসলমানরা কোনো বিশেষ ব্যক্তির কথা বা রায় উদ্ধৃত করতো না। কোনো ব্যক্তির রায়ের ভিত্তিতে ফতোয়াও দিতো না। কোনো বিশেষ ব্যক্তির ফিক্‌হী রায়ের ভিত্তিতে ফিকহের বুনিয়াদ রাখতো না। আঠারো শতকের শ্রেষ্ঠ মুসলিম মনীষী, চিন্তাবিদ ও সমাজ সংস্কারক শাহ অলিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলবী তার হুজ্জতুল্লাহিল বালিগা গ্রন্থে চতুর্থ হিজরী শতকের পূর্বে ও পরে মুসলমানদের অবস্থা বর্ণনা প্রসংগে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে এই দুই শতকে ব্যক্তি বিশেষের অনুসরণের কথা কেউ চিন্তাই করেনি। মুহাদ্দিসদের কাছে ছিল অসংখ্য সহী হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের 'আছার' তথা তাঁদের কথা ও কার্যক্রম। এগুলোর ভিত্তিতে তাঁরা ফতোয়া দিতেন। এমন সব সহী হাদীস ও আছার তাঁদের কাছে ছিল যেগুলোর ওপর সাহাবায়ে কেরামও আমল করে গেছেন। জমহুর সাহাবা ও তাবেঈগণের এমন সব বাণী ও রায় তাঁদের কাছে ছিল যেগুলোর বিরোধিতা করা মোটেই কোনো উত্তম ও প্রশংসনীয় কাজ বলে বিবেচিত হতো না। যদি কোথাও হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য ও অগ্রাধিকার দেবার কারণ সুস্পষ্ট না হতো অথবা কোনো বিষয়ের সমাধানে তাঁদের দিল নিশ্চিন্ত না হতো তাহলে সেক্ষেত্রে তারা ফকীহদের মধ্য থেকে কোনো একজনের সমাধানের দিকে ফিরে যেতেন। আর যদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফকীহদের দুই বা একাধিক অভিমত দেখতেন তাহলে তাদের মধ্য থেকে যাকে বেশি নির্ভরযোগ্য পেতেন তার অভিমত গ্রহণ করতেন। তিনি মদীনার ফকীহ হোন বা কূফার তার পরোয়া করতেন না।

তবে তাদের একটি দল আবার কোনো একটি বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান না পেয়ে পূর্ববর্তী কোনো নির্দিষ্ট ফকীহের যুক্তির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতেন এবং তা থেকে সমস্যার সমাধান নির্ণয় করতেন। তাদের বলা হতো 'আহলে তাখরীজ। তারা কোনো নির্দিষ্ট ফকীহের অভিমতের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করতেন। তাদেরকে অমুকের মযহারের অনুসারী বলে উদ্ধৃত করা হতো। কাউকে হানাফী এবং কাউকে শাফেয়ী বলা হতো। যেমন ইমাম নাসায়ী ও ইমাম বায়হাকীকে ইমাম শাফেয়ীর সাথে সংশ্লিষ্ট করা হতো। এ অবস্থায় মুজতাহিদ ছাড়া কাউকে কাযীর পদে অধিষ্ঠিত করা হতো না এবং কারো ফতোয়াও গ্রহণ করা হতো না। অর্থাৎ কেবল মুজতাহিদকেই ফকীহ বলা হতো।

এ ছিল মুসলমানদের প্রথম তিন চারশো বছরের বুদ্ধিচর্চা। মুসলিম বুদ্ধিজীবি অর্থাৎ উলামা, ফকীহ ও মুজতাহিদগণ আল্লাহর বিধানের আওতায় বুদ্ধিচর্চা করে সারা ইসলামী বিশ্বে কর্ডোভা থেকে কাশগড় এবং তাসখন্দ থেকে কান্দাহার-মুলতান পর্যন্ত এক বিশাল বুদ্ধিবৃত্তিক বলয় সৃষ্টি করেন। এ সমগ্র বলয়ে চিন্তার স্বাধীনতার সাথে সাথে আন্তরিকতাও একট মূল শক্তি হিসেবে সব সময় সক্রিয় থাকে। যখনই আন্তরিকতায় কমতি দেখা দিয়েছে তখনই চিন্তার স্বাধীনতাও ব্যাহত হয়েছে। খিলাফতে রাশেদার পর এমন সব লোক খিলাফত তথা মুসলমানদের ওপর শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার

দায়িত্ব লাভ করলো যারা তার যোগ্য ও হকদার ছিল না এবং একই সঙ্গে ফতোয়া দান ও পূর্ণ দীনী ইল্‌মের অধিকারীও ছিল না। কাজেই পদে পদে তাদের ফকীহগণের দ্বারস্থ হতে হতো। ফকীহ ও আলেমগণের মর্যাদা বেড়ে গেলো। লোকেরা দেখলো আলেমগণ বাদশাহদের এড়িয়ে চলতে চান। অনেকে তাদের দরবারে যেতে অস্বীকার করছেন। কিন্তু বাদশাহরা তাদের দ্বারে দ্বারে ধর্না দিচ্ছেন। ফলে একদল লোক মর্যাদা ও ক্ষমতার নৈকট্য লাভ করার জন্য ইল্‌ম হাসিলে তৎপর হলো। এরপর থেকে একদল আলেম বাদশাহদের পেছনে চলতে থাকেন। ফলে এখানে আন্তরিকতা বাধাগ্রস্থ হয়। স্বার্থবাদিতা প্রাধান্য লাভ করে।

ইল্‌ম ও স্বাধীন বুদ্ধিচর্চা লাঞ্ছিত হয়। এরপরও উলামা ও ফকীহদের একটি দল ক্ষমতার নৈকট্য এড়িয়ে চলে ইলম ও প্রশাসনিক প্রভাবমুক্ত স্বাধীন বুদ্ধিচর্চার মর্যাদা সমুন্নত রাখেন। তাদের প্রচেষ্টা ও সাধনায় ইসলামী জ্ঞান চর্চা পরবর্তীকালেও আল্লাহর বিধানের আওতাধীন থেকেছে। অবশ্য শাসকদের প্ররোচনায় ক্ষমতার নৈকট্য প্রত্যাশী উলামায়ে কেরাম দীনের যুগোপযোগী প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে বুদ্ধিচর্চাকে মাসায়েল ভিত্তিক বিরোধ ও বিতর্কের চারণভূমিতে পরিণত করেন। এই বিতর্কের ক্ষেত্রে তারা বিশেষ করে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ীর বিরোধমূলক মাসায়েল নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করেন। ইমাম মালেক, সুফিয়ান সওরী, ইবনে সিরীন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল প্রমুখ অন্যান্য ইমাম ও মুজতাহিদগণের বিরোধমূলক মাসায়েলের প্রতি কম দৃষ্টি দেন। তারা মনে করেন এ ধরনের বিতর্ক ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে তারা জটিলতর সমস্যার সমাধানে অবদান রাখতে পারবেন। এই বিরোধ ও বিতর্কের বদৌলতে তাঁরা অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। অসংখ্য. মাসায়েল ইসতিমবাত করেন। তাদের এই কয়েক শো বছরের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে ইজতিহাদ ও নতুন উদ্ভাবনে যেমন ভাটা পড়তে থাকে তেমনি তাকলীদ ও বিশেসষ ব্যক্তির রায়ের অনুসরণ করার প্রবণতা বাড়তে থাকে। কালক্রমে তাকলীদ সমগ্র মিল্লাতের ওপর জেঁকে বসে এবং মুসলমানরা ব্যক্তির রায়ের ওপর নিশ্চিন্ততা অনুভব করতে থাকে।

মুসলমানদের এ বুদ্ধিচর্চা বর্তমান যুগ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে বুদ্ধির নিষ্ক্রিয়তা ও আল্লাহর বিধানের আওতায় মুক্ত চিন্তায় অনীহার কারণে তাদের ওপর নেমে এসেছে জুলুমশাহী ও বিজাতির পরাধীনতা। বিগত সত্তর আশি বছরে মুসলমানদের চিন্তার অবক্ষয় যেমন সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছে গেছে তেমনি কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক চিন্তার একটি নতুন দিগন্তও উন্মোচিত হয়েছে। এটা বিশেষ করে সম্ভব হয়েছে আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থায় আল্লাহর বিধানের আওতা বহির্ভূত সমস্ত চিন্তা ও ভাবধারার ব্যর্থতার কারণে। আর এই সংগে মুসলমানদের বিগত তেরশো বছরের ফিক্‌হ চর্চাও একটা পূর্ণাংগ রূপ নিয়েছে। মুআমিলাত, পারস্পরিক লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, প্রশাসন, আইন আদালত ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয়ে বিপুল মাসায়েল একত্র হয়েছে।

মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্র অংশ এখনো ঐতিহ্যাশ্রয়ী। আল্লাহর বিধানের আওতায় বুদ্ধিচর্চায় তারা বিশ্বাসী। তাদের বৃহত্তর অংশ ইসলাম বৈরী না হলেও বিভ্রান্ত। তবে সার্বিকভাবে সমগ্র মুসলমান সমাজ কুরআন সুন্নাহর অনুগত। ঐতিহ্যাশ্রয়ী মুসলিম বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর একটি বিশাল অংশে রয়েছেন উলামায়ে কেরাম, ইসলামিক স্কলারস ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ। আধুনিক শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে তাদের অনেকের যোগাযোগও যথেষ্ট গভীর। আধুনিক বিশ্ব পরিবেশ সম্পর্কে তারা যথেষ্ট সচেতন। তারা জানেন, আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থার যারা পরিচালক তাদের অনেকেই নিজেদের ব্যর্থতা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হওয়ার পরও ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে সফলতায় পৌছানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আল্লাহর বিধানের বাইরেই তাদের অবস্থান। আধুনিক প্রযুক্তির বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক দিয়ে তারা বিশ্বকে এমন এক অবস্থায় এনে পৌছিয়ে দিয়েছেন যেখানে সারা দুনিয়া একটি গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। কোনো গভীর চিন্তা ও ধারালো যুক্তি এর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে অগ্রসর হতে ও প্রভাব বিস্তার করতে এখন আর যুগ যুগান্ত এবং বছর ও মাসের পরিধির প্রয়োজন হয়না। আবার সভ্যতা, চিন্তা ও বুদ্ধির বিবর্তনের এমন এক পর্যায়ে

মানুষ পৌঁছে গেছে যেখানে নিখাদ সত্যকে মেনে নেবার প্রবণতা মানুষের মধ্যে নতুনভাবে জাগ্রত হচ্ছে। এমনিতে সত্যানুসন্ধিৎসা মানুষের স্বভাবজাত। কিন্তু তার পরও যুগে যুগে বিশাল মানবগোষ্ঠী সত্যকে জানার পর তাকে মেনে নিতে অস্বীকার করে এসেছে। বর্তমান বিশ্ব সংস্কৃতিতে এধরনের প্রাচীরের সংখ্যা কমে আসছে। প্রাচীন ও মধ্য যুগের তুলনায় আধুনিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনেকটা জিদ ও হঠধর্মিতামুক্ত। সত্যকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারলে তাকে গ্রহণ করার মানসিকতা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে।

এইসময় মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধিচর্চা পুরোপুরি আল্লাহর বিধানের আওতায় এগিয়ে চলার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আল্লাহর কিতাব ও রসূলের স. সহী হাদীস হবে এই বিধানের ভিত্তি। আমাদের সমগ্র ফিক্হ, উসূল ও মাকাসিদের পরিসর জুড়ে ব্যক্তিবর্গের যে রায় রয়েছে সেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে। সেগুলো আমাদের চিন্তা দর্শনের ভিত্তি নয়। আমাদের চিন্তাকে সমন্বিত, সুসংহত ও সঠিক পথাশ্রয়ী করার জন্য সেগুলো হবে সবচেয়ে বড় দিক নির্দেশক ও নজির। আতীয়ুল্লাহা ওয়া আতীয়ুর রসূলা ওয়া উলিল আম্‌রি মিনকুম-'তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রসূলের আনুগত্য করো আর তোমাদের নেতৃবর্গের, এখানে আল্লাহর স্বয়ংসম্পূর্ণ আনুগত্য এবং রসূলের স্বয়ংসম্পূর্ণ আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু নেতৃবর্গের ক্ষেত্রে 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, নেতৃবর্গের আনুগত্য হবে আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যের আওতাধীন। অর্থাৎ তাঁদের সিদ্ধান্ত কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হলে গ্রহণযোগ্য অন্যথায় নয়। পরবর্তী বাক্যে আরো সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে; ফা-ইন তানাযা'তুম ফী শাইইন ফারুদ্দূহূ ইলাল্লাহি ওয়ার্ রসূল-'এরপর যদি কোনো ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে সে বিষয়টিকে ফিরিয়ে দাও আল্লাহ ও রসূলের দিকে।' (আন নিসা : ৫৯) অর্থাৎ আল্লাহ ও রসূলই হচ্ছেন চূড়ান্ত ফায়সালাকারী ও সীমা নির্দেশক। তোমরা নিজেরা কেবলমাত্র তাঁদের নির্ধারিত সীমানার মধ্যে অবস্থানকারী। আমাদের কাছে আল্লাহ ও রসূলের বিধান মজুদ রয়েছেঃ নিখাদ সত্য ও নির্ভেজাল অহী। এই আলো এবং নূর আর দুনিয়ার অন্য কোনো জাতির কাছে নেই। আমরা এই আলোয় নিজেদের পথ তৈরী করে নিতে এবং সমগ্র দুনিয়াবাসীকে পথ দেখাতে পারি। দুনিয়া এখন এক অর্ডারের আওতায় চলে আসার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আর এই অর্ডারটা একমাত্র আল্লাহর বিধানই হতে পারে।

আমরা আগেই প্রমাণ করেছি এ বিধানটা চৌদ্দশো বছরের পুরানো নয়, যেমন অজ্ঞতা বশত এবং নিজেদের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে যথেষ্ট অসচেতন হবার কারণে একদল লোক ধারণা করে থাকে। রিসালাতে মুহাম্মদীর অবসানের পরও যেমন সাহাবায়ে কেরামের পর থেকে তিন চারশো বছর পর্যন্ত অত্যন্ত সফলতার সাথে ইজতিহাদের মাধ্যমে এ বিধান কার্যকর হতে থেকেছে। মুসলমানদের শাসনাধীন সমগ্র বিশ্ব মানব সমাজ কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়া অন্য কোনো বিধান দ্বারা শাসিত হয়নি। আমরা এ বিধানের আরো একটি পার্শ্ব উৎস ইজমার নাম এজন্য নিচ্ছিনা যে এটি কুরআন ও সুন্নাহর আওতাধীন। এ সমগ্র সময়ব্যাপী ইসলামী শাসন যুগোপযোগী ছিল এবং ইসলাম বিশ্বকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ঠিক তেমনি পরবর্তী কালেও যখন ইজতিহাদের ধারা ধীরে ধীরে বিশুষ্ক হতে থেকেছে এবং তাকলীদ তথা ব্যক্তির রায়ের ভিত্তিতে মুসলমানরা শাসিত হয়েছে তখনো কুরআন ও সুন্নাহর আওতার বাইরে তারা যাননি। কারণ কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে করা ব্যক্তির ইজতিহাদের ভেতরে অবস্থান করেছে মুফতির ফতোয়া। এই ফতোয়ার ভিত্তিতে দেশ, সমাজ ও জনতা পরিচালিত হয়েছে। পরবর্তী যুগে এই মুফতিগণই ফকীহ হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কী খিলাফতের অবসানের পর এ যুগেরও সমাপ্তি ঘটে। অর্থাৎ তেরশো বছর পর্যন্ত এ বিধানটা যেকোনো ফরমে বিশ্বব্যবস্থায় টিকে ছিল। এর মূল দুর্বলতা ছিল কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সরাসরি ইজতিহাদের ধারা শুকিয়ে যাওয়া।

প্রতি একশো বছরে বিশ্বে অনেক পরিবর্তন এসেছে। আমরা দেখেছি অন্যান্য ধর্ম প্রথম একশো বছরেই বিকৃত হয়ে ভিন্নরূপ গ্রহণ করেছে এবং তার পয়গম্বর আনীত ধর্ম স্বরূপে টিকে থাকতে পারেনি। কিন্তু ইসলাম তার দুটি মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহর অবিকৃত থাকার এবং এইসাথে নবীর দেখানো পথে ইজতিহাদের মাধ্যমে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও পরিবেশের উপযোগী করে ইসলামী বিধানের আওতায় জীবনকে গড়ে তোলার কারণে একদিকে যেমন আল্লাহর পূর্ণ উলূহীয়াত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তেমনি অন্যদিকে বান্দার উবূদীয়্যাতও পূর্ণতা লাভ করেছে। আর নবীর নবুওয়তের মূল লক্ষই হচ্ছে আল্লাহর পূর্ণ উলূহিয়াত প্রতিষ্ঠা এবং বান্দার উবুদীয়াতকে পূর্ণতা দান করা। প্রথম একশো দু'শো তিনশো বছর ইসলামে এর মধ্যে তেমন কোনো হেরফের হয়নি। ইসলাম তিনশো বছরে পুরাতন ও সেকেলে হয়ে যায়নি। বরং সমসময়ের প্রেক্ষিতে আধুনিক ও প্রগতিশীল ছিল। বিশ্বের অবস্থান ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগে। ইসলাম তাকে টেনে আনছিল আধুনিক যুগে। তারপর ইজতিহাদের ধারা বিশীর্ণ হতে হতে এবং তাকলীদের পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করতে কয়েক শতক অতিক্রান্ত হয়। মুসলমানরা ইসলাম থেকে শক্তি সঞ্চয় করতে যতই অপারগ হয়ে পড়ছিল বিশ্বে জাতিদের মধ্যে অস্থিরতা ততই বেড়ে চলছিল। এই অস্থিরতার গর্ভ থেকে পশ্চিমা বিশ্বে যতগুলো পরিবর্তনের জন্ম হয়েছে তার কোনোটাই বিশ্ব মানবতার কল্যাণে টেকসই অবদান রাখতে পারেনি। এক, ধর্ম থেকে রাজনীতি আলাদা হয়েছে। সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে চেংগিজী অত্যাচারে জর্জরিত করেছে। অসাধুতা, শঠতা, প্রতারণা, দুর্নীতি, শোষণ ও অকল্যাণে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। দুই, চিন্তার স্বাধীনতার নামে সততা, নৈতিকতা ও সদাচারের সংগাই পাল্টে দেয়া হয়েছে। ফরাসী বিপ্লব সততা ও নৈতিকতার কোনো স্থায়ী ও কল্যাণকর চিন্তাদর্শন দাঁড় করাতে পারেনি। বরং এর গর্ভ থেকে এক ধরনের ফ্যাসিবাদের দাপট দেখি বিশ্ব জুড়ে। তিন, শিল্প বিপ্লব ইউরোপীয় রেনেসাঁর কোনো কৃতিত্ব নয়। এটি মানব সভ্যতার অগ্রগতির ধারাবাহিকতার একটি পর্যায়। শিল্প বিপ্লবের ফলে মানুষের সামাজিক অবস্থানের যে পরিবর্তন ঘটেছে পশ্চিমা চিন্তাদর্শন তার মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করতে পারেনি। সামাজিক ও পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, লুণ্ঠন ও শোষণ এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ এবং নব্য উপনিবেশবাদী কায়দায় মানুষকে দাসে পরিণত করাই হয়েছে এর নীট ফল। ইসলাম ও মুসলমানরা এক্ষেত্রে নিজেদের কোনো ভূমিকা পালন করতে পারেনি। কারণ সামগ্রিক বিবেচনায় তারাও পশ্চিমা রঙে রঞ্জিত হয়ে গেছে।
এখন পশ্চিমা চিন্তাদর্শনগুলোর ব্যর্থতার পর বিশ্বে যে অশান্তি, অস্থিরতা ও অবিশ্বাস বাসা বেঁধেছে তা দূর করে সমগ্র মানব সমাজে স্বস্তি, শান্তি ও বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারে একমাত্র ইসলাম, ইসলামী মূল্যবোধ, ইসলামী নৈতিকতা ও ইসলামী চিন্তাদর্শন। আল্লাহর উলূহীয়াত ও বান্দার উবূদীয়াত প্রতিষ্ঠাই হবে এর একমাত্র পথ। অর্থাৎ মানুষ এই পৃথিবী পৃষ্ঠে, যতগুলো ক্ষমতা ভোগ করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সমস্ত ক্ষমতার একমাত্র উৎস আল্লাহ। তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। আল্লাহ থেকে এ ক্ষমতা লাভ করতে হবে এবং আল্লাহর নির্দেশ মতো একে ব্যবহার করতে হবে। আর মানুষ মানুষের দাস নয়, একমাত্র আল্লাহর দাস, গোলাম ও বান্দা। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী এবং আল্লাহর বিধানকে কার্যকর করার জন্য সে অন্য মানুষের হুকুম পালন করবে। আল্লাহর বিধান বিরোধী কোনো হুকুম সে পালন করবেনা (লা তাআতা লি মাখলুকিন ফীমা'সিয়াতিল খালেক ঃ স্রষ্টার বিধান অমান্য করে সৃষ্টির হুকুম পালন করা যাবে না-হাদীস)
এক অর্ডারের এই বিশ্বের যুগে ইসলামই একমাত্র যুগোপযোগী, সর্বাধুনিক ও প্রগতিশীল চিন্তাধারা। সারা বিশ্বে একে কার্যকর করার জন্য আল্লাহর বিধানের আওতায় কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক ইজতিহাদের ধারা একটি স্বীকৃত ও চিরন্তন পদ্ধতি। মুসলিম বুদ্ধিজীবী শ্রেণী বিশেষ করে উলামা ও ইসলামিক স্কলারর্সদের দায়িত্ব এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী। তারা মিল্লাতের ও মানবতার সবচেয়ে সচেতন অংশ। তাদের অবশ্যই এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

– আবদুল মান্নান তালিব

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ঃ ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ১৯, পৃষ্ঠা ঃ ৯-২৪

ফিকহের স্বরূপ ও তার অর্থের ক্রম সংকোচন

মওলানা মুহাম্মদ তাকী আমিনী

ফিকহের স্বরূপ

ফিকহ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে বিদারণ ও 'উন্মোচন' (شق)। 'আল্লামা যামাখ্শারী তাই বলেছেন ঃ الفقه حقيقته الشق والفتح

'দলীল, পরিবেশ, তর্ক ইত্যাদির বেড়াজাল বিদীর্ণ করে শরীয়তের বিধান উন্মোচন করার নাম ফিকহ।'[১]

ইমাম গাযালী র. ফিকহের পারিভাষিক অর্থের ইংগিতে বলেছেন, ফিকহ হচ্ছে যথার্থ জ্ঞান, উপলব্ধি, গভীর চিন্তা-ভাবনা ও দীনের ব্যাপারে গভীর ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি।[২]

ফলাফলের দিক থেকে বাস্তবে এ দুয়ের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে তত্ত্বানুসন্ধানী আলেমগণ ফকীহ শব্দের প্রয়োগ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

الفقيه العالم الذى يشق الاحكام و يفتش عن حقائقها و يفتح ما استغلق منها

'ফকীহ হচ্ছেন এমন আলেম যিনি (চিন্তা-ভাবনা ও গভীর গবেষণার মাধ্যমে) আইনের উন্মোচন করেন, তার প্রকৃত তাৎপর্য অনুসন্ধান করেন এবং কঠিন ও জটিল বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট করেন।'[৩]

ফিকহের এই গভীরতায় পৌঁছার জন্য একদিকে যেমন জ্ঞান ও গবেষণাগত যোগ্যতার প্রয়োজন তেমনি অন্যদিকে প্রয়োজন মস্তিষ্ক তথা চিন্তার পরিচ্ছন্নতা এবং আত্মিক পবিত্রতার। কারণ এগুলো ছাড়া চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কাংখিত পরিপক্কতা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এই সত্যটি উপলব্ধি করেই ইমাম হাসান বসরী র. ফকীহের মধ্যে নিম্নোক্ত গুণাবলী থাকা অপরিহার্য গণ্য করেছেন। তিনি বলেছেন, ফকীহ হচ্ছেন এমন ব্যক্তি–

১. যিনি দুনিয়ার প্রতি মনোনিবেশ করেন না (অর্থাৎ দুনিয়া তাঁর জীবনের মূল লক্ষ হয় না।

লেখক ঃ পাকিস্তানের খ্যাতিমান গবেষক, আলেম। ওআইসির কেন্দ্রীয় ফিকহ একাডেমীর সদস্য।

২. যিনি আখেরাতের ব্যাপারেই অধিক উৎসাহী।
৩. যিনি দীনের ব্যাপারে পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী।
৪. যিনি আল্লাহর হুকুম সর্বক্ষণ মেনে চলেন এবং পরহেজগারীর পথ অবলম্বন করেন।
৫. যিনি কোন মুসলিমকে বেইজ্জত করা ও তার অধিকার হরণ করা থেকে দূরে থাকেন।
৬. যার দৃষ্টি থাকে সামগ্রিক স্বার্থের প্রতি অর্থাৎ (জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থকে ব্যক্তি স্বার্থের ওপর প্রাধান্য দেন)।
৭. অর্থ-সম্পদের লোভ যাঁর থাকে না।[৪]

ইমাম গাযালী র. একজন ফকীহের জন্য প্রায় এই একই ধরনের গুণাবলী অপরিহার্য গণ্য করেছেন। তবে এক্ষেত্রে তাঁর নিম্নোক্ত বাক্যটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ ঃ

فقيها فى مصالح الخلق فى الدنيا

'ফকীহ্ হচ্ছেন, পৃথিবীতে আল্লাহ্র সৃষ্টিকূলের কল্যাণ ব্যাপারে রহস্য জ্ঞানী।'[৫]
এ কারণে আল্লামা ইবনে আবেদীন নিম্নোক্ত মত প্রকাশ করেছেন ঃ

ومن لم يكن عالما باهل زمانه فهو جاهل

'যে ফকীহ তাঁর যুগের লোকদের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ তিনি আসলে মূর্খ।'[৬]

মুহাদ্দিস ও ফকীহের মধ্যে পার্থক্য

হযরত 'আমাশ র. মুহাদ্দিস ও ফকীহের মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। এ থেকে ফকীহের জ্ঞানের গভীরতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।
তিনি বলেন ঃ يامعشر الفقها انتم الاطباء ونحن الصيادلة

'হে ফকীহগণ! তোমরা হচ্ছো চিকিৎসক আর আমরা ঔষধ বিক্রেতা।'[৭]
অর্থাৎ মুহাদ্দিসদের কাজ হচ্ছে, ভালো ভালো ঔষধ একত্র করে সাজিয়ে রাখা আর ফকীহদের কাজ হচ্ছে সেখান থেকে ঔষধ বাছাই করা, রোগ নির্ণয় করা এবং রোগ ও রোগীর স্বভাব প্রকৃতি অনুধাবন করে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র দেয়া। সাধারণভাবে যদিও এই পার্থক্যটা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, কারণ ইমাম বুখারী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণের একাধারে হাদীস এবং ফিকহ উভয়ের জ্ঞান অস্বীকার করার উপায় নেই, তবুও প্রত্যেক দলের কাজের ধরন ও দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এ পার্থক্য বেশ প্রত্যক্ষ করা যায়।
বলাবাহুল্য, উল্লেখিত ব্যাখ্যা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ফকীহ হবার জন্য অনুসন্ধান ও গবেষণার উন্নত মানের যোগ্যতা, জাতীয় তথা জনগণের স্বভাব-

প্রকৃতি মেজাজ অনুধাবন ক্ষমতা, মাসলিহাত অর্থাৎ কল্যাণকর ব্যবস্থা কোনটি সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকা, রোগ ও রোগীর মনস্তত্ত্ব জানা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় অপরিহার্য।

কুরআনে ফিকহের ভিত্তি

কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতটি হচ্ছে ফিকহের ভিত্তি। এখানে এর অন্তর নিহিত অর্থটির প্রতিও সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে ঃ

فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ.

'কেনইবা মু'মিনদের প্রত্যেকটি গ্রুপ থেকে একটি করে দল বের হয়ে (সফরে) আসেনি, যাতে তারা দীনের গভীর জ্ঞান ও অন্তরদৃষ্টি অর্জন করতে পারে এবং শিক্ষা-দীক্ষা লাভের পর যখন তারা নিজেদের গ্রুপের মধ্যে ফিরে যাবে তখন (অশিক্ষা ও গফলতির পরিণাম থেকে) লোকদের সতর্ক করবে, যাতে তারা দুষ্কৃতি থেকে বাঁচতে পারে।' (সূরা-আত্-তাওবা ঃ ১২২)

আয়াতে যে ভাষায় ফিকহের জ্ঞান অর্জনের কথা বলা হয়েছে তাতে মনে হয়, ফিকহের জন্য হৃদয় ও মস্তিষ্কের একটি বিশেষ কাঠামো নির্ধারিত রয়েছে। এবং সেই মোতাবিক এ দুটিকে ঢেলে সাজাতে হবে। এভাবে হৃদয় ও মস্তিষ্ককে ঢেলে সাজানো সম্ভব না হলে অবস্থা ও ঘটনাবলী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ইপ্সিত ফিক্হী দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি হয় না।

এ কারণে ইমাম গাযালী র. 'তাফাক্কুহ ফিদ্দীন'-এর মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত মনে করেছেন ঃ

এক. প্রবৃত্তিজাত বিপদগুলোর সূক্ষ্মতা অনুধাবন করা।

দুই. আমল বিনষ্টকারী ব্যাপারগুলো অনুধাবন করা।

তিন. আখেরাতের জ্ঞান লাভ করা।

চার. পরকালীন নিয়ামতগুলোর প্রতি চরম আকর্ষণ অনুভব করা।

পাঁচ. দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করার সাথে সাথে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করার ক্ষমতা অর্জন করা।

ছয়. হৃদয়ে আল্লাহ্র ভয়ের প্রাধান্য থাকা।

নিজ বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে ইমাম সাহেব ইসলামের প্রথম যুগের ফিকহ শব্দের অর্থের ব্যাপকতার বিষয়টি পেশ করেছেন। উপরন্তু উল্লেখিত কথাগুলোকে لِيَتَفَقَّهُوا فِى الدِّيْنِ আয়াতাটির অর্থের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন।৮ উসূলবিদ-গণের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা থেকে এর সমর্থন মেলে ঃ

'সত্য আকীদার প্রতি বিশ্বাস ও মিথ্যা আকীদা প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে দীনের গভীর তত্ত্বজ্ঞান অর্জিত হয়। এছাড়া হৃদয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সাথে যেসব কাজের সম্পর্ক রয়েছে দীনের গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য সেগুলো এমনভাবে সম্পাদন করতে হবে যাতে শরীয়ত প্রবর্তকের চূড়ান্ত লক্ষ অর্জিত হয়।'[৯]
উল্লেখিত নীতিগুলো কার্যকর করার মাধ্যমে দীনি মেজাজ গঠিত হয় এবং মন-মস্তিষ্কের পরিশীলন হয়। অতপর চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি হয় যা ফিকহের জন্য অপরিহার্য।

হাদীসে ফিকহের অর্থ

নিম্নোল্লেখিত হাদীসগুলো ফিকহের অর্থের গভীরতার সমর্থক। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين

'আল্লাহ যার কল্যাণ করতে চান তাকে দীনের তাফাক্কুহ বা গভীর ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দান করেন।'[৯ক]
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার সাহাবায়ে কেরামকে বলেন ঃ

ان رجلا ياتونكم من الا رض يتفقهون فى الدين فاذا اتوكم فا ستوصوا بهم خيرا

'লোকেরা দীনের ব্যাপারে তাফাক্কুহ হাসিল করার জন্য তোমাদের কাছে আসবে নানান স্থান থেকে। যখন তারা আসবে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে।[১০] এটা আমার অসিয়াত। তিনি আরো বলেন ঃ

رُبَّ حامل فقه غير فقيه وربّ حامل فقه الى من هو افقه منه

'অনেক সময় ফিকহ বহনকারী অর্থাৎ নতুন অবতীর্ণ কোন আয়াত বা রসূলুল্লাহ স.-এর কোন নির্দেশের বাহক বা বর্ণনাকারী খোদ ফকীহ হয় না, আবার অনেক সময় ফিকহের বাহক এমন কারো কাছে ফিক্হ বহন করে নিয়ে যায়, যে অধিকতর সূক্ষ্মদর্শী ফকীহ।[১১]

বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তি প্রসূত বিচক্ষণতা

ফিকহী বিধান দেয়ার জন্য যে ধরনের তাফাক্কুহের কথা বলা হয়েছে, তাতে বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তি উভয়ের প্রেরণায় কাজ করা এবং উভয়ের মধ্যে সমতা ও ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য গণ্য করা হয়। যে চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী এ দুটির মধ্য থেকে কোনো একটির নেতৃত্ব ও নির্দেশনা লাভ থেকে বঞ্চিত হবে অথবা এ দুয়ের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হবে না তা অন্য কোনো কাজের জন্য যদিও

বা সহায়ক হতে পারে ফিকহী বিধান উদ্ভাবন তথা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তার বিশেষ কোনো ভূমিকা থাকা সম্ভব হবে না। সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে যে, ইল্‌ম, (জ্ঞান) ও উপলব্ধির একমাত্র উৎস হচ্ছে বুদ্ধি। অথচ কুরআন মজীদের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, ইল্‌ম ও উপলব্ধির আর একটি উৎস আছে এবং সেটি হচ্ছে 'কলব' বা হৃদয় যেমন বলা হয়েছে ঃ

لَهُمْ قُلُوْبٌ لاَّ يَفْقَهُوْنَ بِهَا.

'তাদের হৃদয় আছে বলে কিন্তু সে হৃদয়ে তাফাক্কুহ (গভীর তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির ক্ষমতা) নেই।'

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ.

'আল্লাহ তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন।'

اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا.

'অথবা তাদের হৃদয়ে তালা মেরে দেয়া হয়েছে কি ?'

فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُوْنَ.

'তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে, তাই তারা বুঝে না।'

এই আয়াতগুলোয় হৃদয়ের সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান ও উপলব্ধির অনুপস্থিতির কথা অস্বীকার করা হয়েছে। তবে বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার প্রয়োজনের কথা অস্বীকার করা হয়নি। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, বুদ্ধির উচ্চ শিখরে আরোহণ করা সত্ত্বেও অনেক মানুষ সূক্ষ্ম অন্তরদৃষ্টির অধিকারী হতে পারেনি।

আধুনিক যুগের কোনো কোনো লেখক উপরে উদ্ধৃত আয়াতে উল্লেখিত 'কলব' শব্দের অনুবাদ করেছেন 'বুদ্ধিবৃত্তি'। তাঁদের এ ত্রুটিপূর্ণ অনুবাদের কারণ আধুনিক গবেষণা ও অনুসন্ধান 'কলব'কে কোনো বিশেষ স্থান দিতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমান কালের গবেষণা ও অনুসন্ধান কি মানব জগতের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে? তা ছাড়া এ পর্যন্ত মানুষ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে কেবলমাত্র সেগুলোই কি মানব প্রকৃতির চূড়ান্ত কথা? সেগুলো ছাড়া কি আর কিছুই নেই? যদি এর জবাব নেতিবাচক হয় এবং নিসন্দেহে এর জবাব নেতিবাচক তাহলে 'কল্‌ব'-কেও 'ইলম ও উপলব্ধির একটি মাধ্যম হিসেবে মেনে নিলে তাকে কেমন করে মানব প্রকৃতির বিরোধিতা বলে গণ্য করা যেতে পারে? কিন্তু 'কল্‌ব' বললে গোশতের একটা টুকরা বুঝায় না, যা মানুষের দেহে ফানুসের আকারে বক্ষদেশের বাম দিকে ঝুলানো থাকে। বরং 'কল্‌ব' হচ্ছে ঐ গোশতের টুকরাটির সাথে সম্পর্কিত একটি অদৃশ্য শক্তি। উসূলবিদগণ এ শক্তিটিকে 'কলবের' চোখ আখ্যা দিয়েছেন।[১২] ঐ টুকরাটির সাথে কলবের সম্পর্ক ঠিক তেমনি যেমন বিশেষিতের

সাথে বিশেষণের সম্পর্ক এবং যেমন স্থানের সাথে অবস্থানকারীর সম্পর্ক হয়। এই কল্‌ব সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

لا يسعنى الا قلب مؤمن

'মুমিনের কল্‌ব ছাড়া আর কোথাও আমার (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র) স্থান হতে পারে না।' আর এরি মাধ্যমে সেই ফিরাসাত (বিচক্ষণতা) সৃষ্টি হয়, যে সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله

'মুমিনের ফিরাসাতকে ভয় করো, কারণ সে আল্লাহ্‌র নূর দিয়ে দেখে।'

'হিকমত' শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ

বুদ্ধি ও কলবের সমন্বয়ে যে ধরনের ইল্‌ম ও ফিরাসত-এর সৃষ্টি হয় আইন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে তার সহায়তা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। কুরআন মজীদ তাকে একটি ব্যাপক অর্থবাচক শব্দ 'হিকমত' দিয়ে প্রকাশ করেছে।
ইরশাদ হয়েছে ঃ

يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا

'আল্লাহ যাকে চান 'হিকমত' দান করেন। আর যাকে হিকমত (সম্পদ) দান করা হয়েছে তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে।'
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসেও হিকমত শব্দটির আসল তাৎপর্যের দিকে ইংগিত করা হয়েছে ঃ

من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين

'আল্লাহ যার কল্যাণ করতে চান তাকে দীনের তাফাক্কুহ (সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি) দান করেন।'[১৩]
ইমাম মালেক র. একজন শ্রেষ্ঠ ফকীহ্ এবং ফিকহ্ শাস্ত্রে মালেকী মাসলাক তথা পন্থা (মাযহাব)-এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বলেন ঃ

الحكمة والعلم نور يهدى به الله من يشاو

'হিকমত ও ইলম হচ্ছে নূর। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে এ নূরের মাধ্যমে পথের দিশা দিয়ে থাকেন।'[১৪] অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

ليس العلم بكثرت الروايات ولكنه نور يجعله الله فى القلوب

'বিস্তর রেওয়ায়াত আসলে 'ইলম' নয় বরং ইলম হচ্ছে এমন একটি নূর, আল্লাহ যার উন্মেষ করেন মানুষের কলব-এ।'[১৫]

'ইলম ও হিকমতের অধিকারীর আলামত বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি এক স্থানে বলেন ঃ

لكن عليه علامة ظاهرة وهو التجافى عن دار الغرور والانابة الى الخلود

'হিকমতের অধিকারীর পরিষ্কার আলামত হচ্ছে ঃ মায়াময় জগৎকে এড়িয়ে চলা। (অর্থাৎ দুনিয়ার স্বার্থকে নিজের জীবনের মূল লক্ষে পরিণত না করা) এবং চিরন্তনের (আখেরাতের) দিকে প্রত্যাবর্তন করা।'[১৬]
এখানে 'ইলম বলতে 'ইলমে নবুওয়ত' এবং 'হিকমত' বলতে এমন ধরনের উন্নত ও উচ্চতম যোগ্যতা নির্দেশ করা হয়েছে যা নবুওয়তের মেজাজ ও প্রকৃতি চিহ্নিত করতে সক্ষম হওয়ার মাধ্যমেই অর্জিত হয় এবং দীনের গূঢ় রহস্য ও আইনের সূক্ষ্মতম পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

মুহাক্কিক (গভীর তত্ত্বানুসন্ধানী) ও মুফাস্‌সিরগণের হিকমতের অর্থ

মুহাক্কিক ও মুফাস্‌সিরগণ হিকমতের কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। যেমন ইমাম রাগেব ইসফাহানী বলেছেন ঃ

الحكمة اصابة الحق بالعلم والعقل

'ইল্‌ম ও বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে সত্যে পৌঁছে যাওয়াই হচ্ছে হিকমত।'[১৭]
লিসানুল 'আরব গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

الحكمة عبارة عن معرفة افضل الا شياء بافضل العلوم-

'শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম জিনিসকে সর্বোত্তম 'ইলমের মাধ্যমে জানাই হচ্ছে হিকমত।'[১৮]
হিকমতের অন্যান্য অর্থগুলো হচ্ছে ঃ

এক. বুদ্ধির পথ নির্দেশনা ও কলবের অন্তর্দৃষ্টি।
দুই. বস্তুর যথার্থ স্বরূপ জানা।
তিন. প্রত্যেক বস্তুকে তার যথাযথ স্থান দানের যোগ্যতা।
চার. হক ও বাতিলের মধ্যে ফয়সালা করার শক্তি।
পাঁচ. নফস এবং শয়তানের সূক্ষ্মতম অনুপ্রবেশ সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি।
ছয়. শয়তানী ও মানবিক চাহিদাগুলোর মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা।
সাত. অসৎবৃত্তিগুলোকে নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করে তার প্রতিরোধের সঠিক ব্যবস্থা অবলম্বন।
আট. সৃষ্টির বিভিন্ন অবস্থার জ্ঞান।
নয়. এমন তত্ত্ব ও তথ্যের জ্ঞান যার মাধ্যমে মানবাত্মা পূর্ণতায় পৌঁছে যায়।
দশ. বিশেষ ধরনের বিচক্ষণতা ইত্যাদি।[১৯]

ফলকথা, এমন সব যোগ্যতা ও ক্ষমতা যার মাধ্যমে মানুষ বস্তুর আসল রূপ ও তাৎপর্য জানতে এবং কার্যকারণের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে তাকে হিকমত

বলে। 'আল্লামা ইবনে মিসকাওয়াইহ র. নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকেও হিকমতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন ঃ মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি, প্রত্যুৎপন্নতিত্ব, স্বচ্ছ চিন্তা ও সহজ শিক্ষার ক্ষমতা। এ সবগুলো উল্লেখ করার পর তিনি আরো বলেছেন ঃ

وبهذ الاشياء يكون حسن الا ستعداد للحكمة

'এই জিনিসগুলোর মাধ্যমে হিকমতের সুসম যোগ্যতা সৃষ্টি হয়।'[২০]

ইলমের তিনটি পর্যায়

উল্লেখিত হিকমত ও আলোচ্য 'তাফাক্কুহ'-এর তাৎপর্য বুঝবার জন্য নিম্নলিখিত আয়াতটিও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে ঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ ايٰتِه وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ.

'নিসন্দেহে মুমিনদের ওপর আল্লাহ ইহ্সান করেছেন যখন তিনি তাদের মধ্যে পাঠিয়েছিলেন একজন রসূল, যিনি হচ্ছেন তাদেরই অন্তর্ভুক্ত যিনি আল্লাহ্র আয়াতগুলো তাদের পড়ে শোনান, তাদেরকে পরিচ্ছন্ন করেন এবং তাদেরকে শেখান কিতাব ও হিকমত। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৬৪)

এই আয়াতটিতে রসূলের কর্মের তিনটি পর্যায় বর্ণিত হয়েছে ঃ

এক. يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ ايٰتِه রসূল তাদেরকে তাঁর আয়াতগুলো পাঠ করে শোনান। আরবী ভাষা জানার মাধ্যমে এই পর্যায়ে উপনীত হওয়া সম্ভব যাতে কুরআন মজীদের উপদেশ ও স্মারক উপলব্ধি করতে পারে। যে কেউ চেষ্টা করলে এ পর্যায়ে পৌঁছতে পারে বলে কথাটির অর্থে সর্বজনীনতা আছে। আর এই অর্থের প্রেক্ষিতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ.

'উপদেশ গ্রহণের জন্য আমি কুরআনকে সহজ বানিয়েছি। কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?' (সূরা আল-কামার ঃ ১৭)

দুই. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ তিনি তাদেরকে কিতাবের তা'লীম দেন। এই তা'লীমের লক্ষ হচ্ছে, শিক্ষার্থীর মধ্যে এমন যোগ্যতা সৃষ্টি করা, যাতে সে আয়াতের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারে কুরআনে যে সব মূলনীতি ও মৌল বিষয় বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর যথার্থ মর্যাদা ও গুরুত্ব নির্ধারণ করতে পারে এবং খুঁটিনাটি বিষয়গুলোকেও চিহ্নিত করতে পারে। এই পর্যায়ে উন্নীত হবার জন্য চাই কুরআন মজীদের আয়াতের পূর্বাপর আলোচনার প্রতি দৃষ্টি দান, সূরাগুলোর মূল বিষয়বস্তু অনুধাবন, সূরাগুলো যে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় নাযিল হয়েছিল তার জ্ঞান লাভ, পরোক্ষ ইংগিতাদি হৃদয়ংগম করা, যাতে শিক্ষার্থী নতুন অবস্থা বা প্রশ্নাদির সম্মুখীন হয়ে তার জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির সাহায্যে রায় দিতে সক্ষম হয়, প্রয়োজন বোধ করলে অন্য

আলেমদের সাথে আলোচনা করে বিধান দান করতে পারে। এ প্রসঙ্গে প্রণিধান যোগ্য ঃ فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ

'যদি তোমরা না জেনে থাকো, তাহলে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যারা জ্ঞান বুদ্ধি রাখে।' (সূরা আননাহ্ল ঃ ৪৩) অর্থাৎ নিজ জ্ঞান গবেষণার অগম্য বিষয়ে অপরের জ্ঞান-গবেষণার সাহায্য গ্রহণ করো।

তিন. يُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ তাদের হিকমত শিখান। হিকমত ইলমের সবচেয়ে উঁচু পর্যায় এবং ফকীহের যোগ্যতার শীর্ষে অবস্থিত। কার্যকারণ অনুসন্ধান করে, এবং গূঢ় তত্ত্ব অনুধাবন করে উৎস ও লক্ষ জেনে নেয়াই হিকমত। চিন্তা ও কর্মশক্তির পূর্ণতা লাভ করার পরই এ পর্যায়ে উপনীত হওয়া যায়।

আইনের জগতে এই পর্যায়ে উপনীত হবার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর জ্ঞান অপরিহার্য গণ্য করা হয়।

১. আইনের ঐতিহাসিক পটভূমির জ্ঞান,
২. আইনের ভূমিকা সম্পর্কিত জ্ঞান,
৩. ইল্লত ও কার্যকরণ অনুধাবন,
৪. মনস্তত্বের গভীর জ্ঞান,
৫. প্রকৃতিগত আকর্ষণ ও প্রবণতার অনুধাবন,
৬. জাতীয় ও দলীয় মেজাজ সম্বন্ধে জ্ঞান,
৭. জাতীয় জীবনের বিভিন্ন যুগ এবং জাতির উত্থান পতন ইত্যাদির জ্ঞান। কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতটিতে এই পর্যায়টির উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا.

'আর যাকে হিকমত (রূপ সম্পদ) দান করা হয়েছে, তাকে প্রভুত কল্যাণ দান করা হয়েছে।' (সূরা বাকারা ঃ ২৬৯)

আর لِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ (প্রত্যেক সীমানার জন্য জানার স্থান রয়েছে) হাদীসে সম্ভবত এই পর্যায়ের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। কারণ হাদীসে উল্লেখিত মাত্লা এমন একট ঝারোকাকে বলা হয় যা উঁচুতে থাকে। মানুষ উঁচুতে উঠে তার মাধ্যমেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে। অনুরূপভাবে ইলম এমন এক সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত যার ফলে মানুষ সেই উচ্চতায় উপনীত হয়ে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের জ্ঞান লাভ করে প্রত্যেক বস্তুর গভীরে পৌছে যায়। অতপর তার সমস্ত দিকগুলো সামনে রেখে একজন তথ্যাভিজ্ঞ পর্যালোচক হিসেবে আলোচনা করে।

এটিই হচ্ছে ফকীহের ইলমের আসল স্থান। অন্যান্য স্থান থেকেও কিছুটা ফায়দা হাসিল করা যেতে পারে। তবে শর্ত হচ্ছে, আইন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করার মতো মস্তিষ্ক থাকতে হবে এবং আইনের ভূমিকা ও তার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে হবে।

হিকমতের অধিকারীদের পর্যায় ও মর্যাদা

সুউচ্চ ও সুগভীর হিকমতের অধিকারীরা বিভিন্ন পর্যায় ও মর্যাদায় বিভক্ত। হিকমতের সবচেয়ে উঁচু পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম। তারপর আইন উদ্ভাবনের ব্যাপারে নবীদের সাথে যে যতটা নৈকট্যের অধিকারী ছিলেন এবং যার যত বেশী সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সেই প্রেক্ষিতেই তার স্থান নির্ধারিত হয়।

হিকমতের একটি পর্যায়ে অবস্থান করছিলেন সাইয়িদুনা হযরত উমর রাদি আল্লাহু আনাহু ও অন্য কতিপয় সাহাবা। তারা শরীয়ত ও শরীয়তের মেজাজের সাথে এতই একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন যে তার ফলে একাধিক বিষয়ে তাঁদের মতের অনুকূলে অহী নাযিল হয়েছিল। অনুরূপ ভাবে অনেক পারদর্শী সাহাবা এমন পর্যায়ে অবস্থান করছিলেন যে তার ফলে কেবলমাত্র ইলহাম ও ব্যক্তিগত ঝোঁক প্রবণতাই তাঁদেরকে শরীয়তের দিকে পথ প্রদর্শনে সহায়তা করতো।

মানুষের মেজাজ, প্রকৃতি ও প্রবণতা যখন শরীয়তে ইলাহীয়ার সাথে একাত্ম হয়ে তার মধ্যে মিশে যায় তখন সেই প্রবণতাই শরীয়তের কাংখিত চাহিদায় পরিণত হয়।

প্রথম যুগে ফিকহ

নীচে আমরা প্রথম যুগে ফিকহের সংগা ও অর্থের গণ্ডি কিভাবে ক্রমান্বয়ে সংকীর্ণ হয়ে আসছিল তার আলোচনায় আসছি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক যুগে ফিক্‌হ শাস্ত্র যথারীতি গ্রন্থিত হয়নি এবং তার সীমারেখাও নির্ধারিত হয়নি। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনাহুম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে-কাজটি যেভাবে করতে দেখতেন সেকাজটি সেভাবে করাকে দীন ও দুনিয়ার সাফল্য ও সৌভাগ্য মনে করতেন। হযরতের কোন কাজটির গুরুত্ব কোন পর্যায়ের, এ ধরনের কোনো প্রশ্নই তাদের সামনে ছিল না। কোন কাজটি তিনি অভ্যাস হিসেবে করেছেন আর কোনটি ইবাদত হিসেবে, এই কাজটি অপরিহার্য এবং ঐ কাজটি অপরিহার্য নয়– এমন প্রশ্ন তাদের মনে জাগতো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইত্তিবা ও আনুগত্যের ধরনটিকে তারা প্রাণের চাইতে বেশী ভালোবাসতেন।[২১]

যদি এমন কোনো অবস্থা দেখা দিতো, যে অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো কাজ বা তাঁর কোনো হেদায়াত পাওয়া যেতো না, তাহলে তখন যারা বেশী ইলমের অধিকারী হতেন না তাঁরা অধিক ইলমের অধিকারী সাহাবাগণকে জিজ্ঞেস করে আয়াতে বর্ণিত নির্দেশের ওপর আমল করতেন। আর অধিক ইলমের অধিকারীরা কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বিধানের আলোকে ঐ নতুন অবস্থার পর্যালোচনা করতেন। কুরআনে বর্ণিত হুকুমের উদ্দেশ্য, লক্ষ ও কারণ

অনুসন্ধান করে সামঞ্জস্যশীলতার প্রেক্ষিতে নতুন অবস্থাটির জন্য ঐ একই হুকুম জারী করে দিতেন। যেমন হযরত শাহ্ অলিউল্লাহ্ র. বলেছেন ঃ

اجتهد برايه وعرف العلة التى اراد رسول الله عليها الحكم فى منصوصا ته فطرد الحكم حيثما وجدها لا يالو جهدا فى موافقة غرضه عليه السلام-

ব্যাখ্যা ঃ যে সাহাবী উদ্ভূত পরিস্থিতির সম্মুখীন তিনি তার মত প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থাৎ যে ইল্লতের ভিত্তিতে অনুরূপ কোন অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রকাশ্য উক্তিতে যে হুকুম জারী করেছিলেন, তদ্রূপ কোন ইল্লাত উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান কি না সে বিষয়ে গবেষণার বেলায় চেষ্টার কোন ত্রুটি করতেন না। ইল্লতের সন্ধান পাওয়া গেলে অনুরূপ হুকুম চালাবার পক্ষে মত স্থির করতেন, প্রতিষ্ঠিত করতেন। অতপর যেখানে সেই ইল্লাতটি পাওয়া যেতো সেখানে তাঁরা এ হুকুমটি জারী করতেন। তবে হুকুমের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ্য উদ্দেশ্য জানার জন্য তাঁরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতেন। আর তারি সামঞ্জস্যশীলতার প্রেক্ষিতে একটির হুকুম অন্যটির ওপর লাগাতেন।

সাহাবায়ে কেরামের পর তাবেঈদের যুগ; তাঁরা কুরআনের জ্ঞান রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস ও সাহাবাগণ-এর বাণী ও কার্যাবলী সাহাবাগণ-এর কাছ থেকেই সংগ্রহ করেন এবং অবস্থা ও সমস্যাবলী বিশ্লেষণ করার ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করে সেই একই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেন যা সাহাবাগণ করেছিলেন? এমন কি–

وكان سعيد بن المسيب وابراهيم وامثا لها جمعوا ابواب الفقه اجمعها وكان لهم فى كل باب اصول تلقو ها من السلف

'আর হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব র. ও ইবরাহীম র. প্রমুখ তাবেঈগণ ফিকহের নানাবিধ উপকরণ সংগ্রহ করেন। প্রত্যেক প্রসঙ্গের কতিপয় মূলনীতিও তাঁরা হাসিল করেছিলেন সাহাবাদের কাছ থেকে।' ২৩

এরপর এলো তাবে তাবেঈদের যুগ। তারা পূর্ববর্তীদের সমগ্র জীবন এবং অবস্থা ও সমস্যাবলী অনুবাধন করেন বুদ্ধিবৃত্তি ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে এবং উপরোক্ত রূপে ইজতিহাদ করেন।

প্রথম যুগে ফিকহের অর্থ দীনি জীবনের সমগ্র বিভাগে পরিব্যাপ্ত ছিল

ফিকহের ক্রমোন্নতি শিরোনামে প্রত্যেক যুগের ফিকহের বিস্তারিত অবস্থার ওপর মন্তব্য পরবর্তী পর্যায়ে এসে যাবে। এখানে কেবল আমি এতটুকুই বর্ণনা করবো যে, প্রথম যুগে ফিকহের অর্থ ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। প্রথম যুগে ইসলামী জীবনের

সমস্ত বিভাগের সমুদয় প্রশ্নের বিধান ফিকহ্ শব্দের অর্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেমন উসূল গ্রন্থসমূহে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

ان الفقد فی الزمان القديم كان متنا ولا لعلم الحقيقة وهی الا لهيات عن مبا حث الذات والصفات وعلم الطريقة وهی مباحث المنجيات والمهلكات وعلم الشر يعة الظا هرة–

'প্রাচীন যুগে ইলাহীয়াত ফিকহের তথা আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর জ্ঞান সম্বলিত ইলমে হাকীকত, নাজাত দানকারী ও ধ্বংস আবর্তে নিক্ষেপকারী আমল ও কার্যাবলী সম্বলিত ইলমে তরীকত এবং বাহ্যিক হুকুম আহকাম ও মাসায়েল সম্বলিত ইলমে শরীয়তে যাহেরী– সবকিছুই ফিকহের অন্তর্ভুক্ত ছিল।'[২৪]
অর্থাৎ সে যুগে ফিকহের প্রভাব বলয় এতো বেশী ব্যাপক ছিল যে, সমস্ত দীনি ইল্ম তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং ফিকহ্ শব্দটি বললে সব কিছু বুঝা যেতো। এর ফলে ইমাম আবূ হানীফা র. ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ইমামগণের বর্ণনা থেকে ফিকহের যে অর্থ নির্ধারিত হয় তার সার নির্যাস হচ্ছে ঃ
'ফিকহ্ মাসায়েলের সমাধান উদ্ভাবন করার এমন একট ক্ষমতা ও দীনে গভীর অন্তর্দৃষ্টির নাম যার মাধ্যমে শরীয়তের হুকুম আহকাম, মারেফতের রহস্য ও হিকমতের বিষয়াবলী সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। উপরন্তু নিত্য নতুন খুঁটিনাটি মাসায়েলের সমাধান উদ্ভাবন ও তাদের সূক্ষ্মতর জ্ঞান অর্জিত হয়। যে ব্যক্তি এই গভীর দীনি অন্তর্দৃষ্টি ও মাসায়েলের সমাধান উদ্ভাবন করার ক্ষমতা রাখেন তাঁকেই ফকীহ্ বলা হয়।[২৫]
তাঁরা সংক্ষেপে ফিকহ্র যে সংগা নির্দেশ করেছেন তা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

الفقه معرفة النفس مالها وماعليها

'ফিকহ্ হচ্ছে এমন সব বস্তুর তাৎপর্য জানার নাম যা লাভজনক এবং যা ক্ষতিকর।'[২৬]
'যা লাভজনক' ও 'যা ক্ষতিকর' এদুটির এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

ماينتفع به النفس وما يتضرر فی الدنيا والاخرة–

'যার সাহায্যে নফস দুনিয়া ও আখেরাতে ফায়দা হাসিল করে আর যার সাহায্যে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতির সম্মুখীন হয়।'[২৭]
ফিকহের উপরোল্লিখিত সংগায় কোনো ইলম বা শাস্ত্রকে বিশেষিত করা হয়নি। বরং ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ফিকহ্কে বিচার করা হয়েছে। যে কারণে লাভ-ক্ষতির মানদণ্ড অনুযায়ী প্রত্যেকটি উপকারী ইলম ও শাস্ত্র এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এবং প্রত্যেকটি ক্ষতিকর বিষয় এ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

ফিকহকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার কারণে ইমাম আবূ হানীফা (র) আকায়েদের একটি কিতাব লেখেন এবং তার নাম দেন 'ফিকহ আকবার।'[২৮]

পরবর্তীকালে ফিকহের পরিধির ক্রম সংকোচন

দীর্ঘকাল পর্যন্ত ফিকহের এই অর্থই প্রচলিত থাকে। এই অর্থের ভিত্তিতে তার সমস্ত বিধান কার্যকর হতে থাকে। পরবর্তীকালে গ্রীক দর্শনের প্রতিক্রিয়ায় আকায়েদ শাস্ত্রের সহজ সরল চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তার বক্তব্য বিষয়গুলো দীর্ঘ ও জটিলতর হয়ে যেতে থাকে। এ অবস্থায় আকায়েদ একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ লাভ করে। অতপর ইলম কালাম নামে তা খ্যাতি লাভ করে।

এই পর্যায়েও বিজদানীয়াত (জানা ও উদ্ভাবন করার শক্তি) ফিকহের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাই শারহে মিনহাজ ইত্যাদি কিতাবগুলোতে বিজদানী তথা মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলোকে (প্রবৃত্তির অন্তরনিহিত যোগ্যতার সাথে যেগুলোর সম্পর্ক) ফিকহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ, এই সুস্পষ্ট বক্তব্যটি অনুধাবন করা যায় যাতে বলা হয়েছে ঃ

ان تحريم الحسد والرياء من الفقه

'হিংসা ও রিয়ার (প্রদর্শনেচ্ছা) হারাম হওয়ার বিষয়টি ফিকহের সাথে সম্পর্কিত।'[২৯] প্রকৃতপক্ষে হিংসা ও রিয়া এবং এই ধরনের আরো সমস্ত অসৎ কর্ম, চিন্তা ও মনোবৃত্তি ফিকহের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো দূর করার জন্য কেবলমাত্র জ্ঞান যথেস্ট নয়। বরং এ জন্য বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।

তারপর গ্রীক দর্শন ইত্যাদি বাইরের প্রভাবসমূহ যখন আরো বেশী প্রাধান্য বিস্তার করে তখন 'বিজদানীয়ত' ও একটি পৃথক শাস্ত্রের রূপ লাভ করে এবং "তাসাউফ" নামে পরিচিতি লাভ করে। ফলে এখন আকায়েদ ও নৈতিকতা এই দুটো বিষয় ফিকহের গন্ডি থেকে বেরিয়ে জ্ঞানের স্বতন্ত্র দুটো শাখার রূপ লাভ করলো।

গবেষক ফকীহগণ এই সংকোচনকে সুনজরে দেখেননি

গভীর মনোযোগ সহকারে অবশ্য একথাটি বিশ্লেষণ করতে হবে যে, মিল্লাতে ইসলামীয়ার চিন্তাশীল ও গবেষক আলেমগণ এই সংকুচিত কর্মধারাকে সুনজরে দেখেননি। বরং তারা এই কার্যপ্রণালীর কঠোর সমালোচনা করেছেন। ইমাম গাযালী র. ফিকহ শব্দটিকেও এমন শব্দগুলোর অন্তর্ভুক্ত করেছেন যেগুলোর অর্থের মধ্যে অসৎ স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হেরফের করা হয়েছে।[৩০] যেমন তিনি বলেন ঃ

ফিকহ শব্দটির অর্থের মধ্যে লোকেরা বিশেষ অর্থ গ্রহণ করে নিয়েছে। বর্তমানে ফিকহ বলতে বুঝানো হচ্ছে কতগুলো অভিনব ও অদ্ভূত ধরনের খুঁটিনাটি বিষয়ের জ্ঞান, তাদের ইল্লাত ও কার্যকারণের অবগতি এবং অযথা বাক্য ব্যয়। এমন সব কথার সংরক্ষণকে ফিকহ বলা হচ্ছে যাদের সম্পর্ক খুঁটিনাটি বিষয়ের এবং তাদের

ইল্লাত ও কার্যকারণের সাথে। যে ব্যক্তি উপরোল্লিখিত জিনিসগুলোর মধ্যে বেশী মশগুল থাকে তাকেই ফিকহের বড় আলেম মনে করা হয়।[৩১]
আর এক জায়গায় নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলেন ঃ ফিকহ্ জ্ঞান অর্জন করার উদ্দেশ্য কুরআন হাকীমে বর্ণনা করা হয়েছে– لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ (যাতে তারা নিজেদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে এবং ভয় দেখাতে পারে) আর প্রথম যুগের ফিকহ্কে কার্যকর করলেই এ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। তালাক, ইতাক (ক্রীতদাসের মুক্তি) লিআন ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয়ের জ্ঞান অর্জনে এ উদ্দেশ্যে সাধিত হতে পারে না।
বরং অনেক সময় কেবলমাত্র ঐ বিষয়গুলোর প্রতি স্থায়ী দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার ফলে হৃদয় কঠিন হয়ে যায় এবং আল্লাহ্র ভয় মন থেকে উধাও হতে থাকে। যেমন আমাদের যুগের মুফতীদের মধ্যে আমরা দেখছি তাদের মন কঠোর হয়ে গেছে এবং সেখান থেকে আল্লাহর ভয় তিরোহিত হয়েছে।"[৩২]

সংকোচনের পর ফিকহের সংগা

যাহোক এভাবে ফিকহের পরিসর সংকুচিত করার পর তার যে অর্থ প্রচলিত হয়েছে তার বিভিন্ন পরিচয় আমরা উসূলের কিতাবগুলোতে পাই। এর মধ্যে গভীর অর্থ ব্যঞ্জক ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তথা সংগাটি আমরা নিচে উদ্ধৃত করছি।

الفقه حكمة فرعية شرعية–

"ফিকহ্ হচ্ছে এমন হিকমত যাদ্বারা নানা শাখায় শরীয়তের আহকাম উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়।"[৩৩]
অধিকাংশ ফকীহ্ ফিকহ্কে এভাবে সংগায়িত করেছেন ঃ

العلم بالاحكام الشرعية عن ادلتها التفصيلية–

"ফিকহ্ শরীয়তের আইনের এমন এক ধরনের ইল্মের নাম যা তার বিস্তারিত যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে অর্জিত হয়।"[৩৪]
ফিকহের এই সংগায় ফিকহ্কে মানুষের একটি তাত্ত্বিক গুণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু পূর্বে উল্লেখিত সংগার তুলনায় এ সংগা অনেক নিম্নমানের। কারণ এই সংগায় ফিকহ্কে 'হিকমত' বলা হয়েছে। আর হিকমত হচ্ছে অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের ইল্ম। তবুও ভালো, সংগায় এই অর্থের মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তি এবং যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করার ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু নিম্নলিখিত সংগাটি এদিক দিয়ে একেবারেই হতাশাব্যঞ্জক। এতে বলা হয়েছে ঃ

الفقه مجموعة الاحكام المشروعة فى الاسلام–

'ইসলামী শরীয়তের বিধিবদ্ধ আহকাম সমষ্টির নাম ফিকহ।' এই সংগায় ফিকহ্কে শুধুমাত্র বিধান সমূহের সমষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। এর বেশীর

ভাগ সম্পর্ক হচ্ছে তথ্যের সাথে এবং ইলমের সাথে নামমাত্র সম্পর্ক জুড়ে দেয়া হয়েছে। উসূলবিদগণ ফিকহের এই পর্যায়টির জন্য নিম্নোক্ত ভাষায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন ঃ

ثم لما صارت العلوم صناعات غلب الا ستعمال فى المسائل–

'তারপর যখন সব ইলম কতগুলো শিল্পের আকার ধারণ করলো তখন ফিকহ শব্দের প্রয়োগ প্রধানত মাসায়েলের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়ে গেলে।'৩৫

ফিকহের আলোচ্য বিষয়গুলোর বিভাগ

ফিকহের অর্থের মধ্যে এই সংকোচন এবং ফিকহের কার্যক্রমের মধ্যে পরিবর্তনের পর ফিকহের সম্পর্ক থেকে যায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর সাথে ঃ

১. ইবাদাত ঃ যা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখে এবং জীবনের বিস্তৃত অঙ্গনে বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি অবলম্বনের নির্দেশ দেয়।

২. মু'আমিলাত ঃ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধিসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো পারস্পরিক সহযোগিতা ও পরস্পর এক সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে নির্ধারিত হয়েছে। যেমন কেনাবেচা, ঋণ, ভাড়া, আমানত, যামানত, জামিন রাখা ইত্যাদি।

৩. মানাকিহাত (বিয়ে শাদী) ঃ মানবের বংশ-রক্ষা সংক্রান্ত মানব বংশ ধারার স্থায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত বিধি বিধান, যার মধ্যে রয়েছে ঃ বিয়ে, তালাক, ইদ্দত, বংশধারা, অভিভাবকত্ব, অসীয়ত, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়সমূহ।

৪. উকবাত (দণ্ডবিধি) ঃ অপরাধ ও তার শাস্তির ব্যাপারে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। হত্যা, চুরি, ডাকাতি, মিথ্যা দোষারোপ, কিসাস, রক্তমূল্য ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।

৫. মুখাসিমাত (দ্বিপাক্ষিক বিবাদ) ঃ এর মধ্যে রয়েছে আদালতী বিষয়সমূহ যথা ঃ অভিযোগ বিধি, ও হাকিমের কাছে বিচার প্রার্থনা করার নীতি সমূহ।

৬. হুকুমত ও খিলাফত ঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক লেনদেন, যুদ্ধ ও সন্ধির বিধান, মন্ত্রীত্ব, প্রশাসন, কর প্রয়োগ ও আদায় ইত্যাদির বিস্তারিত বিধান। যেসব বিধান ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রচলিত ছিল। এসব বিবরণ কিতাবুসসিয়ার ও কিতাবুল আহকামিস সুলতানীয়ায় পাওয়া যায়।

ফিকহের এই সমগ্র বিধান একই সঙ্গে একই সময় অস্তিত্ব লাভ করেনি, একথা অতি সহজে বোঝা যায়। অবস্থা ও চাহিদার সাথে সম্পর্কিত হয়ে পর্যায়ক্রমে উন্নতি লাভ এবং বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছে একে। পরবর্তী পর্যায়ে আরো বিস্তারিতভাবে আমরা এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো।

অনুবাদ ঃ **আবদুল মান্নান তালিব**

তথ্যপঞ্জি

১. হাকীকাতুল ফিকহ, ১ম খণ্ড।
২. এহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন, ১ম খণ্ড, ২৪ পৃষ্ঠা।
৩. হাকীকাতুল ফিকহ, ১ম খণ্ড।
৪. এহ্ইয়াউল উলূমিদ্দীন, ১ম খন্ড।
৫. ঐ
৬. হাকীকতুল ফিকহ, ১ম খণ্ড।
৭. নাশ্রুল উরফ, ১২০ পৃষ্ঠা, (মা'আরিফ থেকে)।
৮. এহইয়াউল উলূমিদ্দীন, ১ম খণ্ড, ২৪ পৃষ্ঠা।
৯. শারহে মুসাল্লামুস সুবূত, ১১ পৃষ্ঠা।
৯ক. বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত, কিতাবুল 'ইলম।
১০. তিরমিযী ও মিশকাত ঃ কিতাবুল 'ইলম।
১১. তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও মিশকাত কিতাবুল 'ইলম।
১২. নূরুল আনওয়ার, ১১৮ পৃষ্ঠা।
১৩. বুখারী ও মুসলিম।
১৪. তরজমানু'স-সুন্নাহ, ১ম খণ্ড।
১৫. ঐ
১৬. ঐ, ২য় খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা।
১৭. মুফরাদাত, ১২৬ পৃষ্ঠা।
১৮. লিসানুল আরব, ৫ম খণ্ড।
১৯. 'আরাইসুল বায়ান ফী হাকাইকিল কুরআন, ৬ পৃষ্ঠা।
২০. তাহযীবু'ল আখলাক, ৮ পৃষ্ঠা।
২১. আল ইনসাফ- শাহ অলিউল্লাহ (র), ২ পৃষ্ঠা
২২. হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ, ১৪০ পৃষ্ঠা।
২৪. শারহে মুসাল্লামুস সুবূত, পৃষ্ঠা ১০ ও শারহে তালবীহ ফুটনোট, ১০ পৃষ্ঠা।
২৫. ঐ
২৬. ঐ
২৭. শারহে মুসাল্লামুস সুবূত, ১১ পৃষ্ঠা
২৮. তাওযীহ তালবীহ, ২৮ ও ৩০ পৃষ্ঠা।
২৯. শারহে মুসাল্লামুস সুবূত, ১২ পৃষ্ঠা।
৩১. এহইয়াউল উলূমিদ-দীন
৩২. এইহয়াউল উলূম, ১ম খণ্ড, ২৪ পৃষ্ঠা
৩৩. মুসাল্লামুস সুবূত, ৩ পৃষ্ঠা
৩৪. নূরুল আনওয়ার ইত্যাদি।
৩৫. শারহে তওযীহ।

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ঃ ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ১৯, পৃষ্ঠা ঃ ২৫-৪২

চুরির অপরাধ ঃ ইসলামী শরীয়তের বিধান ও বাংলাদেশের দণ্ডবিধি

মুহাম্মদ মূসা

॥ ছয় ॥

চুরি একটি দণ্ডযোগ্য অপরাধ। পৃথিবীর সকল ধর্মের, সকল দেশের আইনে যদিও শাস্তির মাত্রায় তারতম্য আছে তবুও বলা যায়, সমগ্র মানবজাতির দৃষ্টিতেই চৌর্যকর্ম একটি ঘৃণিত, নিকৃষ্ট ও মানবিক মূল্যবোধ বিরোধী দণ্ডযোগ্য অপরাধ। শাব্দিক অর্থ অপরের দ্রব্য না বলে বা গোপনে আত্মসাৎ করা। বাংলাদেশের দণ্ডবিধিতে চুরির সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ

"যে ব্যক্তি, কোন ব্যক্তির দখল থেকে কোন অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে অসাধুভাবে গ্রহণ করার অভিপ্রায়ে অনুরূপ গ্রহণের উদ্দেশ্যে উক্ত সম্পত্তি স্থানান্তর করে, সেই ব্যক্তি চুরি করে বলে গণ্য হয়" (ধারা ৩৭৮)।

উপরোক্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত উপাদানসমূহ প্রতিভাত হয় ঃ (১) সম্পত্তিটি অস্থাবর প্রকৃতির, (২) তা কোন ব্যক্তির দখলে আছে, (৩) অপর ব্যক্তি তা অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে (৪) স্থানচ্যুত করে (৫) দখলদারের সম্মতি ব্যতিরেকে, (৬) সেই ব্যক্তি চোর হিসাবে গণ্য। এসব উপাদানের কোন একটির অভাবে বা অনুপস্থিতিতে চুরি সংঘটিত হতে পারে না। সংজ্ঞায় অস্থাবর শব্দটি অপ্রাসঙ্গিক। কারণ স্থাবর সম্পত্তি স্থানান্তরযোগ্য নয়। অতএব চুরি কেবল অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রেই সম্ভব।

ইসলামী আইনে চুরির সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ "কোন বালেগ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি কর্তৃক অপরের দখলভুক্ত 'নিসাব পরিমাণ মাল' সংরক্ষিত স্থান থেকে গোপনে হস্তগত করাকে 'চুরি' বলে।"

উপরোক্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পাওয়া যায় ঃ (১) গোপনে হস্তগত করা; (২) হস্তগত বস্তু 'মাল' হওয়া; (৩) উক্ত মাল অপরের দখলে থাকা; (৪) তা নিরাপদ সংরক্ষিত স্থান থেকে স্থানান্তরিত করা; (৫) উক্ত মাল চোরের পূর্ণ দখলে আসা; (৬) চুরিকৃত মাল নিসাব পরিমাণ হওয়া; (৭) মালটি স্থানান্তরযোগ্য হওয়া এবং (৮) মাল স্থানান্তরের অসৎ উদ্দেশ্য থাকা।

সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, অপরাধীকে বালেগ অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। এর অর্থ সে যদি মস্তিষ্ক বিকৃত বা নাবালেগ হয়ে থাকে তবে তার উপর চুরির শাস্তি (হদ্দ) কার্যকর হবে না। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ

رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يَفْتِنَ.

"তিন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কলম তুলে রাখা হয়েছে (শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে)ঃ শিশু, বালেগ না হওয়া পর্যন্ত; ঘুমন্ত ব্যক্তি, জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত এবং পাগল, সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত"।[১]

দ্বিতীয় বিষয় হলো, 'মাল গোপনে হস্তগত করা'। এর অর্থ হলো, মালিকের সম্মতি ব্যতীত অথবা তার অনুপস্থিতিতে বা ঘুমন্ত অবস্থায় তার দখলভুক্ত কোন মাল চোর কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করা। এর সাথে তিনটি উপ-শর্ত যুক্ত আছে ঃ (এক) চোর কর্তৃক চুরিকৃত মাল নিরাপদ সংরক্ষিত স্থান থেকে বের করে আনা; (দুই) মালটি সরানোর ফলে মালিকের পূর্ণ দখলমুক্ত হওয়া এবং (তিন) তা সম্পূর্ণরূপে চোরের দখলে আসা। এই শর্তের কোনও একটি শর্ত অপূর্ণ থাকলে হস্তগতকরণ পূর্ণাঙ্গ বলে বিবেচিত হবে না। এক্ষেত্রে চৌর্যকর্মটি সম্পূর্ণ হয়েছে বলে না ধরে বরং চৌর্যকর্মটি শুরু হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

তৃতীয় বিষয় হলো, চুরিকৃত বস্তু বা জিনিসটি 'মাল' হতে হবে। শরীয়তের সংজ্ঞা অনুসারে যেসব বস্তু বা জিনিস বৈধ মাল হিসাবে গণ্য সেই ধরনের মাল হতে হবে। যেমন গবাদী পশু, নগদ অর্থ, সোনা-রূপা ইত্যাদি। অর্থাৎ "যে বস্তু বা জিনিস নগদ অর্থের সাথে বিনিময়যোগ্য, মানুষের ব্যবহারযোগ্য এবং শরীয়ত কর্তৃক অনিষিদ্ধ তাকে 'মাল বলা হয়'। অতএব শূকর, মাদক দ্রব্য, মৃত জীবের গোশত ইত্যাদি মুসলমানদের জন্য মাল নয়, কিন্তু যে ধর্ম তার অনুসারীদের জন্য এগুলো আহার করা বৈধ করেছে তাদের ক্ষেত্রে এগুলো মাল গণ্য হতে পারে। অতএব যা মাল হিসাবে গণ্য নয় তা চুরির পদ্ধতিতে হস্তগত করা হলেও কর্মটি হদ্দযোগ্য চুরি হিসাবে বিবেচিত নয়।

উল্লেখ্য যে, বিশ্বপ্রকৃতিতে আল্লাহ তা'আলা এমন অনেক বস্তু রেখে দিয়েছেন, যা শরীয়তের সংজ্ঞায় মাল নয়, কিন্তু দখল বা হস্তগত করলে মাল হতে পারে। যেমন বন্য গরু-মহিষ-ছাগল-হরিণ, আকাশে উড্ডীয়মান বিহঙ্গকুল, সমুদ্রের মাছ, ঝিনুক, শামুক ইত্যাদি আরো অনেক কিছু। বন্য প্রাণী বা পাখি শিকার করে পোষ মানালে এবং মাছ ধরে হস্তগত করলে তখন তা মাল হিসাবে গণ্য হয়। অনুরূপভাবে কৃত্রিম পন্থায় উৎপাদিত অক্সিজেন মালিকের জন্য মাল হিসাবে গণ্য।

চতুর্থ বিষয় হলো, 'মালিকানা'। চোর যে মালটি যার দখল থেকে স্থানচ্যুত করেছে

উক্ত মালের উপর তার বৈধ মালিকানা থাকতে হবে, অর্থাৎ তিনি আইনত মালের বৈধ মালিক। অতএব চুরিকৃত মালটির মালিকানা যদি প্রমাণিত না হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কর্মটি হদ্দযোগ্য চুরি হিসাবে গণ্য হবে না। উদাহরণস্বরূপ, কোন ব্যক্তি ছিনতাই, রাহাজানি বা আত্মসাৎ করে কিছু মাল নিজ দখলে এনেছে। এ জাতীয় মাল সন্তর্পণে স্থানচ্যুত করার কর্মটি হদ্দযোগ্য চুরি হিসাবে গণ্য নয় এবং মালিকানাহীন বস্তুর সন্তর্পণে স্থানচ্যুত করাও চুরি হিসাবে গণ্য নয়।
পঞ্চম বিষয় হলো আলোচ্য মাল 'সযত্ন হেফাজত' থেকে সন্তর্পণে সরানোর কর্মটি হদ্দযোগ্য চুরি হিসাবে গণ্য। অযত্নে বা অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকা মালের ক্ষেত্রে হদ্দযোগ্য চুরি কথাটি প্রযোজ্য নয়। মহানবী স. বলেন ঃ

لا قَطع في ثمر معلق ولا في حرشة جبل فاذا اواه المراح والجرين فالقطع فيما يلغ ثمن المجن.

"প্রাচীরের বাইরে ঝুলন্ত ফল বা রাতের বেলা পাহাড় থেকে ধরে নেয়া কোন মেষের জন্য হাত কাটার শাস্তি দেয়া যাবে না। তবে মেষ খোঁয়াড়ে আবদ্ধ থাকলে এবং খেজুর শুকাবার খোলা বা গোলায় থাকা অবস্থায় হস্তগত করা হলে হাত কাটা হবে—যদি তার মূল্য একটি ঢালের মূল্যের সমান হয়।"[২]
ষষ্ঠ বিষয় হলো, চুরিকৃত মাল পূর্ণরূপে চোরের দখলে যেতে হবে, শুধু নির্দিষ্ট স্থান থেকে অপসারিত করাই যথেষ্ট হবে না।
সপ্তম বিষয় হলো, চুরিকৃত মালের মূল্য 'নিসাব' পরিমাণ হতে হবে। অর্থাৎ যে পরিমাণ মাল চুরি করলে হদ্দযোগ্য অপরাধ গণ্য হতে পারে—মালের পরিমাণ ততখানি হতে হবে। হানাফী মাযহাব মতে এর পরিমাণ এক দীনার কিংবা দশ দিরহাম। মহানবী স. বলেন ঃ

لا قطع فيما دون عشرة دراهم.

"দশ দিরহামের কম পরিমাণ হলে হাত কাটা যাবে না।"[৩]
বর্তমান কালে দশ দিরহাম=চার দশমিক সাতান্ন (৪.৫৭) গ্রাম স্বর্ণ বা তার সম-পরিমাণ মূল্যের কোন মাল "চুরির নিসাব' হিসাবে গণ্য হবে। উক্ত পরিমাণ স্বর্ণের বর্তমান মাজার মূল্য (২৫/৬/২০০৯. বায়তুল মোকাররম ৯,৬০০.০০ (নয় হাজার ছয় শত) টাকা।
অষ্টম বিষয় হলো, মালটি স্থানান্তরযোগ্য হতে হবে। চুরি প্রসঙ্গে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কারণ চুরি বলা হয় অপরের মাল স্থানান্তরিত করে চোরের দখলে আনয়নকে। যেসব মাল স্থানান্তরযোগ্য নয় তা চুরি করা সম্ভবও নয়।
দশম বিষয় হলো, অপসারণকৃত মাল অন্যায়ভাবে দখল বা মালিকানাভুক্ত করার অভিপ্রায় থাকতে হবে। অতএব হস্তগত বা অপসারণ করা চুরি হিসাবে গণ্য

হওয়ার বিষয়টি চোরের নিয়তের উপর নির্ভরশীল। যেখানে অন্যায়ভাবে গ্রাসের অভিপ্রায় নেই সেখানে কর্মটিকে চুরি হিসাবে গণ্য করা যায় না।[৪]

চুরির প্রমাণ

তিনটি উপায়ে চুরির অপরাধ প্রমাণিত হতে পারে—(১) সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা; (২) অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি দ্বারা; এবং (৩) বাদীর শপথ দ্বারা। চুরির অপরাধ প্রমাণের জন্য বাদী ছাড়া আরো দুইজন বালেগ ও সুস্থ বুদ্ধি-জ্ঞানসম্পন্ন ন্যায়বান মুসলমানের সাক্ষ্যের প্রয়োজন। সাক্ষীর সংখ্যা যদি দুইয়ের কম হয় অথবা একজন প্রত্যক্ষদর্শী ও অপরজন শ্রোতা সাক্ষী হয় তবে সেক্ষেত্রে চৌর্যকর্মটি হদ্দযোগ্য অপরাধের আওতায় আসবে না। ইসলাম ধর্ম প্রত্যেক মুসলমানকে ন্যায়পরায়ণ বলে বিশ্বাস করে, যাবত না তার দ্বারা ন্যায়-ইনসাফের পরিপন্থী কোন কিছু সংঘটিত হয়। আবার বিষয়টি সমসাময়িক যুগের অবস্থার উপরও নির্ভরশীল। দুশো বছর পূর্বে সমাজে যে পরিমাণ সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ লোক পাওয়া যেতো, বর্তমান কালে তার প্রচুর অভাব রয়েছে। অতএব যুগ অনুযায়ী যে ধরনের ন্যায়পরায়ণ লোক পাওয়া যায় তার উপরই নির্ভর করতে হবে।

সাক্ষীর প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট। সেই সাথে তাকে মুসলমানও হতে হবে। উল্লেখ্য যে, ইসলামী শরীয়তে মুসলমানদের মামলা-মোকদ্দমার কোন বিষয়ে কোন অমুসলিমের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, কেবল ওসিয়তের ক্ষেত্র ব্যতীত। এর বহুবিদ কারণ রয়েছে। এখানে এই বিষয় সংক্রান্ত একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

রসূলুল্লাহ স.-এর যুগে এক মুসলিম গোত্রের এক ব্যক্তি অপর মুসলিম গোত্রের এক ব্যক্তির যুদ্ধাস্ত্র চুরি করে। বিষয়টি ফাঁস হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছলে অপরাধী গোত্রের লোকেরা সন্তর্পণে উক্ত অস্ত্রপাতি এক ইহূদীর বাড়িতে তার অজান্তে লুকিয়ে রেখে আসে। রসূলুল্লাহ স.-এর দরবারে মোকদ্দমা দায়ের হলে মুসলমানগণ মূল অপরাধীর পক্ষ অবলম্বন করে এবং ইহূদীকে দায়ী করে। সাক্ষ্যের দ্বারা ইহূদী দোষী সাব্যস্ত হয়। রসূলুল্লাহ স. রায় প্রদান করবেন ঠিক এই মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা ওহী নাযিল করে তাঁকে প্রকৃত ঘটনা অবহিত করেন এবং তদনুযায়ী তিনি ফয়সালা দান করেন। ফলে ইহুদী বেকসুর খালাস পায় এবং প্রকৃত অপরাধী দণ্ডিত হয়।

অভিযুক্তের স্বীকারোক্তির দ্বারাও অপরাধ প্রমাণিত হতে পারে। এক্ষেত্রে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে, তার কাছে কোন মাল না পাওয়া গেলেও এবং সে তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের সুবিধাও পাবে না।

عن ابى امية المخزومى ان رسول الله ﷺ اتى بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله ﷺ ما اخالك

سـرقـت قـال بـلى فـاعـاد عليـه مـرتـيـن اوثـلا ثـا قـال اذهبـوا بـه فـاقـطـعـوه ثـم جـيـؤا بـه فـقطعـوه ثـم جاءوا بـه فـقال لـه قل اسـتـغفـر اللّٰه واتـوب الـيـه فـقـال اسـتـغـفـر اللّٰه واتـوب الـيـه قـال اللـهم تـب علـيـه ثـلا ثـا.

"আবূ উমায়্যা আল-মাখযূমী রা. থেকে বর্ণিত। এক চোরকে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট নিয়ে আসা হলো এবং সে তার অপরাধের স্বীকারোক্তি করলো। কিন্তু তার সাথে কোন মাল পাওয়া গেলো না। রাসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, তুমি চুরি করেছো বলে আমি মনে করি না। সে বললো, হাঁ, আমি চুরি করেছি। তিনি তাকে দু'বার বা তিনবার এভাবে বললেন এবং প্রতিবারই সে স্বীকারোক্তি করে। তিনি বললেন, তোমরা তাকে নিয়ে যাও এবং তার হাত কেটে দাও, অতঃপর তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। অতএব তারা তার হাত কাটার পর তাকে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট নিয়ে এলো। তিনি তাকে বললেন, তুমি বলো, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তওবা করি। সে বললো, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তওবা করি। তিনি তিনবার বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তার তওবা কবুল করো।"[৫]

হানাফী মাযহাব মতে স্বীকারোক্তি তিনবারের কম হলে এবং স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করা হলে হদ্দ কার্যকর হবে না এবং বিষয়টি তা'যীর-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ বিচারকের সুবিবেচনা অনুযায়ী হয় সে খালাস পাবে অথবা লঘু দণ্ড ভোগ করবে। কারণ স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার অপরাধকে সন্দেহযুক্ত করে ফেলে এবং সন্দেহযুক্ত অবস্থায় হদ্দ কার্যকর করা নিষিদ্ধ।

ইসলামী শরীয়ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শপথ অনুষ্ঠানও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকলে এবং বিবাদী অপরাধ অস্বীকার করলে এই অবস্থায় বাদীকে বিচারকের সামনে শপথ করে তার দাবি প্রমাণ করতে হয় এবং তার ভিত্তিতে রায় প্রদান করা হয়। এভাবেও চুরির অপরাধ প্রমাণিত হতে পারে।

মিথ্যা সাক্ষ্যদান

সাক্ষীদ্বয় যদি চুরির মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে এবং তার ভিত্তিতে হদ্দ কার্যকর হয় এবং পরে তারা স্বীকারোক্তি করে যে,তারা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করেছে, এই অবস্থায় তারা উভয়ে অর্থদণ্ডে (দিয়াত) দণ্ডিত হবে। তার পরিমাণ হলো ৫০টি উট বা তার বাজার মূল্য। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ وفى اليد خمسون "এক হাতের দিয়ত পঞ্চাশ উট"।[৬]

চুরির শাস্তি

চুরি হদ্দের আওতাভুক্ত একটি গুরুতর অপরাধ। এর শাস্তি আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত। আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

"পুরুষ অথবা নারী চুরি করলে তোমরা তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও, এটা তাদের কর্মফল এবং আল্লাহ নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড। আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়"।[৭]

এই দণ্ডকে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন 'আদর্শ দণ্ড'। আর এই আদর্শ দণ্ডটিই পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের কঠোর সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু হয়েছে এবং তাদের সাথে যোগ দিয়েছেন ইসলামী বিধান সম্পর্কে সম্পূর্ণ মূর্খ এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত তথাকথিত একদল মুসলমান। যদিও মুসলিম শাসনের শেষপাদ পর্যন্ত এই দণ্ড ভারতীয় উপমহাদেশে কার্যকর ছিল, কিন্তু খৃস্টান ধর্মাবলম্বী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এই দণ্ডকে বাতিল করে দেয় এবং তদস্থলে বর্তমানে বাংলাদেশে কার্যকর দণ্ডবিধি প্রবর্তন করে। দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারায় বলা হয়েছে ঃ

"যে ব্যক্তি চুরি করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যার মেয়াদ তিন বছর পর্যন্ত হতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে"।

আল্লাহ্ প্রদত্ত 'আদর্শ দণ্ড' পরিহার করে মানুষ তার নিজস্ব মনগড়া দণ্ড তৈরি করে নিয়েছে। হাঁ, চুরির যে অপরাধটি কোন কারণে হদ্দ-এর আওতায় আসে না কেবল সেই ক্ষেত্রেই ৩৭৯ নং ধারায় বর্ণিত দণ্ড প্রযোজ্য হতে পারে। ইসলামী আইনে এই দণ্ডকে বলা হয় তা'যীর। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল স. প্রদত্ত সর্বাধিক উন্নত, বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং মানবকল্যাণ প্রসূত বিধান পরিত্যাগ করে মানব রচিত মনগড়া বিধান মুসলিম সমাজে বলবৎ থাকাটাই হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর দুর্ভাগ্য ও দুর্দশার প্রধান কারণ। মানব জীবন ও তার মান-সম্মান এবং তার সম্পদের নিরাপদ হেফাজতের জন্যই এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা কঠোর বিধান দান করেছেন, যাতে কেউ তাতে হস্তক্ষেপ করার দুঃসাহস না করে।

রসূলুল্লাহ্ স. ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে এই শাস্তি কার্যকর করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ স. চুরির অপরাধে সর্বপ্রথম যে পুরুষ ও নারীর হাত কাটার নির্দেশ দেন তাদের নাম ছিল পর্যায়ক্রমে খিয়ার ইবনে আদী ইবনে নাওফাল ও মাখযূম গোত্রের মুররা বিনতে সুফিয়ান ইবনে আবদুল আসাদ।[৮]

রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগের উদাহরণ

হস্ত কর্তন যেহেতু একটি কঠোর শাস্তি, তাই রসূলুল্লাহ্ স. এ ধরনের ঘটনা যথাসম্ভব তাঁর সামনে উপস্থিত করতে নিরুৎসাহিত করেছেন। আবার কেউ তাঁর

সামনে স্বীকারোক্তি করলে তিনি তা যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন (স্বীকারোক্তি সংক্রান্ত হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে)। এই প্রসঙ্গে সাফওয়ান ইবনে উমায়্যা রা.-র হাদীস উল্লেখযোগ্য।

عن صفوان بن امية انه طاف بالبيت وصلى ثم لفّ رداء له من برد فوضعه تحت راسه فنام فاتاه لص فاستله من تحت راسه فاخذه فاتى به النبى ﷺ فقال ان هذا سرق ردائى فقال له النبى ﷺ اسرقت رداء هذا قال نعم قال اذهبا به فاقطعا يده قال صفوان ما كنت اريد ان تقطع يده فى ردائى فقال له فلو ما قبل هذا.

"সাফওয়ান ইবনে উমায়্যা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি কা'বা ঘর তাওয়াফ শেষে নামায পড়লেন, অতঃপর তার পশমী চাদরকে দলামোচা করে তার মাথার নিচে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। ইত্যবসরে এক চোর এসে তার মাথার নিচ থেকে চাদরটি টান দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাকে পাকড়াও করে নবী স.-এর নিকট উপস্থিত করে বললেন, এই ব্যক্তি আমার চাদর চুরি করেছে? নবী স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তার চাদর চুরি করেছ? সে বললো, হাঁ। তিনি বললেন, তোমরা তাকে নিয়ে যাও এবং তার হাত কেটে দাও। সাফওয়ান রা. বললেন, আমার চাদরের কারণে তার হাত টাকা যাবে তা আমি আশা করিনি। তিনি তাকে বললেন, তা আমার নিকট আনার পূর্বে করলে না কেন?"[৯]

হাদীসটির বিভিন্ন বর্ণনায় যেসব শব্দ এসেছে তা নিম্নরূপ ঃ সাফওয়ান রা. বলেন, "আমার চাদরটি তাকে দান করলাম। রসূলুল্লাহ স. বললেন, তাকে আমার নিকট উপস্থিত করার আগে তা করলে না কেন" (ইবনে মাজা)? "আপনি কি তিরিশটি দিরহামের কারণে তার হাত কাটবেন? আমি এটি বাকিতে তার নিকট বিক্রি করলাম। তিনি বলেন, তাকে আমার নিকট উপস্থিত করার পূর্বে তা করলে না কেন" (নাসাঈ, নং ৪৮৮৭)? "আপনি কি তার হাত কাটবেন? তিনি বলেন, আমার নিকট উপস্থিত করার পূর্বে তাকে ছেড়ে দিলে না কেন" (৪৮৮৮)?

অপর হাদীসে রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ

تعافوا الحدود قبل ان تاتونى به فما اتانى من حد فقد وجب.

"হদ্দ সংক্রান্ত মোকদ্দমা আমার নিকট পেশ করার পূর্বে তোমরা তা পরস্পর ক্ষমা করো, উপেক্ষা করো। কারণ তা আমার নিকট পেশ করা হলে শাস্তি অবধারিত হয়ে যাবে"।[১০]

আইনের প্রয়োগ অনন্যনিরপেক্ষ

আদালতে অপরাধ প্রমাণিত হলে শাস্তি কার্যকর করতেই হবে, অসংগত সুপারিশ করা যাবে না এবং নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করা না হলে তার প্রতিক্রিয়ায় গোটা জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এমনকি ধ্বংসও হয়ে যেতে পারে।

عن عائشة ان قريشا اهمتهم المراة المخزومية التى سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله ﷺ ومن يجترئ عليه الا اسامة حب رسول الله ﷺ فقال اتشفع فى حد من حدود الله ثم قام فخطب فقال يايها الناس انما ضل (هلك) من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق الشريف تركوه واذا سرق الضعيف فيهم اقاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد ﷺ سرقت لقطع محمد يدها.

"আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। মাখযূম গোত্রীয় এক নারী চুরির অপরাধ করে কুরাইশদেরকে দুশ্চিন্তায় নিক্ষেপ করে। তারা বললো, তার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে কে কথা বলবে? এই ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স.-এর প্রিয়পাত্র উসামাই দুঃসাহস দেখাতে পারে। অতএব তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে কথা বললে তিনি বলেন, তুমি কি আল্লাহ নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করছো! অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, হে জনগণ! তোমাদের পূর্বেকার জনগোষ্ঠী এ কারণে বিপথগামী (বা ধ্বংস) হয়েছে যে, তাদের আচরণ এই ছিল যে, কোন প্রভাবশালী লোক চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিতো। কিন্তু তাদের মধ্যকার কোন অসহায় দুর্বল গরীব ব্যক্তি চুরি করলে তারা তাকে কঠোর শাস্তি দিতো। আল্লাহর শপথ! মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করতো তবে মুহাম্মাদ স. অবশ্যই তার হাত কেটে দিতো"।[১১]

আবু বকর রা.-র খেলাফতকালে

عن انس قال سرق رجل مِجَنًّا على عهد ابى بكر فَقُوِّمَ خمسة دراهم فَقُطِعَ.

"আনাস রা. বলেন, আবু বকর রা.-র শাসনামলে এক ব্যক্তি একটি ঢাল চুরি করে। এর মূল্য নিরূপণ করা হয় পাঁচ দিরহাম। অতএব তার হাত কাটা হয়"।[১২]

عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه ان رجلا من اهل اليمن اقطع اليد والرِّجْل قَدم فنزل على ابى بكر الصديق فشكا اليه ان عامل

اليمن قد ظلمه فكان يصلى من الليل فيقول ابو بكر وابيك ما ليلك بليل سارق ثم انهم فقدوا عقدا لاسماء بنت عميس امراة ابى بكر الصديق فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بَيَّتَ اهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلى عند صائغ زعم ان الاقطع جاءه به فاعترف الاقطع او شُهِدَ عليه به فامر به ابو بكر الصديق فقْطعت يده اليسرى وقال ابو بكر والله لدعاؤه على نفسه اشد عليه من سرقته.

"আবদুর রহমান ইবনুল কাসেম র. থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। হাত-পা কর্তিত এক ইয়ামানবাসী এসে (মদীনায়) আবু বকর রা.-র বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। সে তার নিকট অভিযোগ করে যে, ইয়ামানের গভর্নর তার প্রতি জুলুম করেছে (তার হাত-পা কেটে দিয়েছে)। সে রাতের বেলা তাহাজ্জুদ নামায পড়তো। আবু বকর রা. বলতেন, তোমার পিতার শপথ! তোমার রাত যেন চোরের রাত না হয়। ঘটনাক্রমে আবু বকর (রা)-র স্ত্রী আসমা বিনতে উমায়েস (রা)-র একটি কণ্ঠহার তারা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ঐ লোকটি তাদের সাথে ঘোরাফেরা করতো আর বলতো, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি এই পুন্যাত্মা পরিবারে চুরি করেছে তুমি তাকে ধ্বংস করো। তারা হারটি এক স্বর্ণকারের নিকট পেয়ে গেলো এবং সে বললো, হাত-পা কর্তিত লোকটি এটি নিয়ে এসেছে। লোকটি অপরাধ স্বীকার করলো অথবা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়া হলো। অতএব আবু বকর সিদ্দীক রা. নির্দেশ দিলে পর তার বাম হাত কেটে দেয়া হয়। আবু বকর রা. বলেন, আল্লাহর শপথ! লোকটি নিজেকে যে অভিশাপ দিচ্ছিল তা আমার কাছে তার চুরি (শাস্তি) থেকেও ভয়াবহ মনে হচ্ছিল"।[১৩]

হযরত উসমান রা.-র যুগে

عَنْ عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن ان سارقا سرق فى زمان عثمان اترجة فامربها عثمان بن عفان ان تُقَوَّمَ فَقُوِّمَتْ بثلا ثة دراهم من صرف اثنى عشر درهما يدينار فقطع عثمان يده.

"আবদুর রহমান-কন্যা আমরাহ র. থেকে বর্ণিত। উছমান রা.-র যুগে এক চোর বাতাবি লেবু (সদৃশ স্বর্ণালংকার) চুরি করে। উছমান রা. তার মূল্য নির্ধারণের নির্দেশ দিলে তাতে তিন দিরহাম নির্ধারিত হয়, এক দীনারের বিনিময়ে বারো দিরহাম হিসাবে। উছমান রা. তার হাত কাটার নির্দেশ দেন"।[১৪]

হযরত আলী রা.-র যুগে

عن الشعبى فى رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطعه على ثم جاءا باخر وقالا اخطئنا فابطل شهادتهما واخذ بدية الاول وقال لو علمت انكما تعمدتما لقطعتكما.

"আশ-শা'বী র. থেকে দুই ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণিত। তারা এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় যে, সে চুরি করেছে। আলী রা. তার হাত কাটার নির্দেশ দেন। পরে তারা অপর এক ব্যক্তিকে নিয়ে এসে বলে, আমরা আসলে ভুল করেছি (চোর এই ব্যক্তি)। তিনি তাদের সাক্ষ্য বাতিল করে দেন এবং (তাদের থেকে) প্রথম ব্যক্তির জন্য দিয়ত (পঞ্চাশ উট বা তার মূল্য) আদায় করেন। তিনি আরো বলেন, আমি যদি জানতে পারতাম যে, তোমরা (সাক্ষীদ্বয়) ইচ্ছাকৃতভাবে এই অপকর্ম করেছো (মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছ), তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের উভয়ের হাত কেটে দিতাম"।[১৫]

পেশাদার চোরের শাস্তি

কোন ব্যক্তি বারবার চুরি করে ধরা পড়লে সে যতোবার ধরা পড়বে ততোবারই হদ্দের আওতায় শাস্তি ভোগ করবে। হযরত জাবের রা. বলেন ঃ

جِيْئَ بسارق الى النبى ﷺ فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق فقال اقطعوه قال فقطع. ثم جِيْءَ به الثانية فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق فقال اقطعوه قال فقطع. ثم جِيْءَ به الثالثة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق فقال اقطعوه. ثم أُتِيَ به الرابعة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما اسرق قال اقطعوه. فاتى به الخامسة فقال اقتلوه قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فالقيناه فى بئر ورمينا عليه الحجارة.

"এক চোরকে নবী স.-এর নিকট উপস্থিত করা হলে তিনি বলেন, তোমরা তাকে হত্যা করো। তারা বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! সে তো চুরি করেছে। তিনি বলেন, তোমরা তার হাত কেটে দাও। রাবী বলেন, অতএব তা কাটা হলো। তাকে দ্বিতীয়বার চুরির অপরাধে উপস্থিত করা হলে তিনি বলেন, তাকে হত্যা করো। তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো চুরি করেছে। তিনি বলেন, তাহলে তার (হাত) কেটে দাও। অতএব তা কাটা হলো। তাকে (একই অপরাধে) তৃতীয়বার উপস্থিত করা হলে তিনি বলেন, তাকে হত্যা করো। তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

সে তো চুরি করেছে। তিনি বলেন, তার (পা) কেটে দাও। তাকে চতুর্থবার উপস্থিত করা হলে তিনি বলেন, তাকে হত্যা করো। তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো চুরি করেছে। তিনি বলেন, তার (পা) কেটে দাও। তাকে (একই অপরাধে) পঞ্চমবার হাজির করা হলে তিনি বলেন, তাকে হত্যা করো। জাবের (রা) বলেন, অতএব আমরা তাকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করলাম, অতঃপর তার লাশ টানতে টানতে একটি কূপে নিয়ে নিক্ষেপ করলাম এবং তার উপর পাথরচাপা দিলাম"।[১৬]

হানাফী ফকীহগণের মতে হদ্দ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তা কার্যকর করা সম্ভব না হলে অপরাধী তা'যীরের আওতায় শাস্তি ভোগ করবে। যেমন ইতিপূর্বে তার চার হাত-পা কাটা গেছে, যেমন উপরোক্ত হাদীসে দেখা যাচ্ছে। পঞ্চম বারের চুরির ক্ষেত্রে হানাফী ফকীহগণ অন্য হাদীসের ভিত্তিতে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের পক্ষপাতী নন। যেমন রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ

لا يحل دَمُ امرئٍ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وانى رسول الله الا باحدىٰ ثلاث النفس بالنفس والثيب الزانى والمفارق لدينه التارك للجماعة.

"যে মুসলমান ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল', তিনটি কারণের যে কোন একটি ব্যতীত তাকে হত্যা করা বৈধ নয় ঃ (১) নরহত্যা করলে, (২) বিবাহিত ব্যক্তি যেনা করলে এবং (৩) মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধর্মত্যাগকারী"।[১৭]

ফকীহগণ পূর্বোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, উপরোক্ত অপরাধী হয়ত ধর্মত্যাগী বা রাজদ্রোহ বা অনুরূপ কোন গুরুতর অপরাধ করায় তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। তাছাড়া পূর্বোক্ত হাদীসটি শেষোক্ত হাদীস দ্বারা রহিত হয়েছে। উপরন্তু রাবী মুসআব ইবনে ছাবিতের দুর্বলতার কারণে এটি একটি যঈফ হাদীস। তথাপি কেবল রাষ্ট্রপ্রধানই পেশাদার চোরকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে পারেন, যদি তিনি তা কোন কারণে অপরিহার্য মনে করেন।[১৮]

মালসহ ধরা পড়লে

চুরি করে অপরাধী মালসহ ধরা পড়লে সে ক্ষেত্রে মালের মালিক তা ফেরত পাবে এবং অপরাধী শাস্তি ভোগ করবে। এক্ষেত্রে ইসলামী দণ্ডবিধি (তা'যীয়ের ক্ষেত্রে) ও বাংলাদেশের দণ্ডবিধির মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। অপরাধীর বাড়িতে প্রাপ্ত মাল অপরাধী তার নিজস্ব মালিকানাভুক্ত বলে দাবি করলে সেক্ষেত্রে সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বিচারক তার সুবিবেচনা অনুযায়ী রায় প্রদান করবেন।

তা'যীরের আওতায় চুরির শাস্তি

অপরাধ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও শাস্তি কার্যকর করার যেসব পূর্ব-শর্ত রয়েছে তার যে কোন শর্তের অভাবে শাস্তি কার্যকর অসম্ভব হলে, সেই ক্ষেত্রে অপরাধী বিচারকের সুবিবেচনা অনুযায়ী দণ্ড ভোগ করবে। তাছাড়া নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহেও হদ্দ (হস্ত কর্তন) কার্যকর না হয়ে অপরাধী বরং বিচারকের সুবিবেচনামতে দণ্ড ভোগ করবে। আর বিচারকের সুবিবেচনা প্রসূত দণ্ডকেই ইসলামী আইনে তা'যীর বলে।

(১) রক্ত সম্পর্কের, বৈবাহিক সম্পর্কের এবং দুধপান জনিত সম্পর্কের নিকটাত্মীয় চুরি করলে সে চুরির দণ্ড ভোগ না করে তা'যীরের আওতায় দণ্ডনীয় হবে। আত্মীয়তার একান্ত ঘনিষ্ঠতার ভিত্তিতে বিচারক অপরাধীকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন। যেমন পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন ইত্যাদি।[১৯] আগন্তুক মেহমানও অনুরূপ অপরাধে তা'যীরের আওতায় দণ্ডযোগ্য হবে।

(২) কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি যদি মনিব বা নিয়োগকর্তার মাল নিরাপদ হেফাজতের স্থান থেকে চুরি করে যেখানে তাকে অবাধে প্রবেশাধিকার দেয়া হয়েছে তাহলে সেও তা'যীরাধীন দণ্ডনীয় হবে।[১০]

(৩) অপরাধী গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বেই অনুতপ্ত হয়ে মাল তার মালিককে ফেরত প্রদান করে কর্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করলে তার উপর হদ্দ কার্যকর হবে না, বিচারক ইচ্ছা করলে তাকে লঘু দণ্ড প্রদান করতে পারেন।

(৪) সরকারী মাল চুরি করলেও হদ্দ কার্যকর হবে না।

(৫) চারণভূমি থেকে পশু চুরি করলেও হদ্দ কার্যকর হবে না।

(৬) বল প্রয়োগে কোন ব্যক্তিকে চুরি করতে বাধ্য করা হলে এবং বলপ্রয়োগ প্রমাণিত হলে হদ্দ কার্যকর হবে না।

(৭) অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে চুরি করতে বাধ্য হলেও হদ্দ কার্যকর হবে না। যেমন দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য বা বেকারত্বের শিকার হয়ে কেউ চুরি করলে তার অপরাধ শাস্তিযোগ্য নয়। হযরত উমর ফারূক রা.-র সময় দুই রাখাল এক ব্যক্তির উট চুরি করে যবেহ করে আহার করে। মালিক মামলা দায়ের করলে তদন্তে প্রমাণিত হয় যে, গৃহকর্তা যুবকদ্বয় দ্বারা পুরো মাত্রায় কাজ আদায় করে; কিন্তু তাদেরকে ঠিকমত পানাহার করায় না। উমর রা. তাদেরকে বেকসুর খালাস দেন এবং গৃহকর্তাকে জরিমানা করেন (বরাতের জন্য ৩১ নং টীকা দ্র.)।

(৮) চুরিকৃত মাল যদি বন্য ঘাস, পাখি, কুকুর, শূকর, মাদক দ্রব্য, বাদ্যযন্ত্র বা অসংরক্ষণযোগ্য পচনশীল দ্রব্য হয় তবে হদ্দ কার্যকর হবে না, তা'যীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে।[২১]

(৯) যদি একাধিক ব্যক্তি একত্রে চুরি করে এবং চুরিকৃত মাল তাদের মধ্যে সমান অংশে বন্টন করা হলে প্রত্যেকের অংশ যদি 'নিসাব' পরিমাণ হয় তবে সকলের উপর হদ্দ কার্যকর হবে, অন্যথায় তা'যীরের আওতায় শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

(১০) চুরিকৃত মাল 'নিসাব' পরিমাণ না হলে এই অবস্থায় হদ্দ কার্যকর করার সমস্ত শর্ত পূর্ণ হলেও সেক্ষেত্রে অপরাধী তা'যীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে। চুরির মূল শাস্তি হলো 'হস্ত কর্তন, পরিভাষায় একেই বলে 'হদ্দ'। যে ক্ষেত্রে হদ্দ কার্যকর করা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে অপরাধী বিচারকের সুবিবেচনা অনুযায়ী শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। এই শাস্তিকে বলে 'তা'যীর'। বাংলাদেশের দণ্ডবিধিতে শরীয়া আইনের এই তা'যীর বলবৎ আছে। এর প্রায় সকল ধারাই তা'যীরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

(১১) যুদ্ধক্ষেত্রে কোন সামরিক বা বেসামরিক ব্যক্তি চুরি করলে হদ্দ কার্যকর হবে না।

عن جنادة بن ابى امية قال كنا مع بسر بن ارطاة فى البحر فاتى بسارق يقال له مصدرٌ قد سرق بُخْتِيَّةً فقال سمعت رسول الله ﷺ يقول لا تقطع الايدى فى السفر ولولا ذلك لقطعتُه.

"জুনাদা ইবনে আবূ উমায়্যা র. বলেন, আমরা বুসর ইবনে আরতাত রা.-র সাথে নৌযুদ্ধের সফরে ছিলাম। এই অবস্থায় মিসদার নামীয় এক চোরকে উপস্থিত করা হলো। সে একটি বুখতী উষ্ট্রী চুরি করেছিল। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি ঃ 'যুদ্ধাভিযানে চুরির শাস্তি কার্যকর হবে না'। এ হাদীস বিদ্যমান না থাকলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।"[২২] তবে সাধারণ সফরে চুরির শাস্তি কার্যকর হবে। এ বিষয়ে ফকীহগণ একমত।

(১২) লুণ্ঠন, ছিনতাই ও আত্মসাতের ক্ষেত্রে চুরির দণ্ড কার্যকর হবে না, তা'যীর কার্যকর হবে। উল্লেখ্য যে, তা'যীরের আওতায় সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। মহানবী (স) বলেন ঃ

ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا.

"লুটেরার হাত কাটা যাবে না। যে ব্যক্তি জনসমক্ষে লুণ্ঠন করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়"।[২৩]

ولا على المختلس قتطع.

"ছিনতাইকারীর হাত কাটা যাবে না"।[২৪]

ليس على الخائن قطع.

"আত্মসাৎকারীর হাত কাটা যাবে না"।[২৫]

(১৩) সশস্ত্র হাইজাকার সন্ত্রাসী যারা দিবালোকে জনসমক্ষে আগ্নেয়াস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করে, খুন-যখম করে মানুষের অর্থকড়ি কেড়ে নেয় তাদের উপর চুরির শাস্তি কার্যকর না হয়ে বরং ডাকাতির শাস্তি কার্যকর হবে। কারণ তাদের কর্মটি ডাকাতির সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।[২৬]

(১৪) বৃক্ষোপরি ফল এবং চারাগাছ (বীজ) চুরির অপরাধ তা'যীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য।

عن رافع بن خديج انه سمع رسول الله ﷺ يقول لا قطع فى ثمر ولا كثر.

"রাফে' ইবনে খাদীজ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছেন ঃ ফল ও চারাগাছ (বীজ) চুরির অপরাধে হস্ত কর্তন নেই।"[২৭]

لا تقطع اليد فى ثمر معلق.

"রসূলুল্লাহ স. বলেন, বৃক্ষোপরি ফল চুরি করলে হাত কাটা যাবে না"।[২৮]

চুরির শাস্তি ও সামাজিক অবস্থা

দু'টি বস্তুর প্রতি মানুষের আকর্ষণ স্বভাবজাত। একটি নারী অপরটি সম্পদ। নারীর প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি নারীর আকর্ষণ আর সম্পদের প্রতি উভয়ের আকর্ষণ তীব্রতর। কুরআন মাজীদে বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে ঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَابِ.

"নারী, সন্তান, পুঞ্জীভূত সোনা-রূপা, চিহ্নিত (উত্তম) অশ্বরাজি, গবাদি পশু ও ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের জন্য আকর্ষণীয় করা হয়েছে। এসবই পার্থিব জীবনের ভোগের বস্তু। আর আল্লাহ, তাঁর নিকটই রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল।"[২৯]

সম্পদ হলো মানুষের, সমাজের, জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স. এই সম্পদ একদিকে অনুমোদিত পন্থায় উপার্জন করতে বলেছেন, অন্যদিকে অননুমোদিত পন্থায় ভোগ-ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। একইভাবে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সহাবস্থান ও সহযোগিতা ব্যতীত মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স. অত্যন্ত পরিশীলিত একটি দাম্পত্য ব্যবস্থা দান করেছেন। যাতে মানুষ এ দু'টি আকর্ষণীয় বিষয় অর্জন করতে গিয়ে অবৈধ পন্থা অবলম্বন না করে। সতর্কতামূলকভাবে এ সম্পর্কিত অপরাধ দমনের জন্য ইসলামে কঠোর বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। সমাজের কোন ব্যক্তি যাতে এ দু'টি ক্ষেত্রে সীমালংঘন করতে দুঃসাহসী না হয় সেদিকে লক্ষ রেখে ইসলামে কঠোর বিধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেনার শাস্তি ও চুরির শাস্তি পাশ্চাত্য সমাজে একপেশে সমালোচনার শিকার হয়েছে নির্মমভাবে। তার সাথে যোগ দিয়েছেন ইসলামী শিক্ষা বিবর্জিত একদল শিক্ষিত মুসলিম। তারা এর প্রেক্ষাপট ও অপরাধ প্রতিরোধক পূর্ব-ব্যবস্থাবলী, অভিযুক্ত করার শর্তাবলী, সামাষ্টিক অবস্থা ইত্যাকার বিষয়গুলো তাদের আলোচনায় এড়িয়ে যান উদ্দেশ্যমূলকভাবে। এ দু'টি দণ্ড কার্যকর করার পূর্বে ইসলামে যে কতো সতর্কতামূলক প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে তা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হবে। যেনা সম্পর্কিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ইতিপূর্বেকার নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে।

(১) সমাজের আর্থিক অবস্থা ঃ কোন ব্যক্তি কী ধরনের সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় আর্থিক অবস্থা বিরাজমান থাকা অবস্থায় চুরি করেছে তা বিচারককে অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হয়। যদি দেশের জনগণ দারিদ্র্য পীড়িত হয়, বিশেষ করে গরীব জনগণকে আর্থিকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দানের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকে, সেই অবস্থায় কোন ব্যক্তি চুরি করলে তাকে হাত কাটার শাস্তি দেয়া যায় না।

আমাদের দেশের ভোগবাদী মানুষের অবস্থা হলো, যারা বিভিন্ন প্রকারের উৎপাদনমুখী কল-কারখানা, শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন তারা কর্মচারীদের এতো কম বেতন দেন যে, মানবেতর জীবন যাপনও তাদের পক্ষে অসম্ভব। তাদের দৃষ্টিভঙ্গী হলো, যতো কম বেতন দিয়ে যতো বেশি কাজ করিয়ে নেয়া যায়। এই অবস্থায় সে যদি তার পেটের দায়ে চুরির মত ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত হয় তবে তাকে কোন যুক্তিতে শাস্তি দেয়া যাবে? হযরত উমর ফারূক রা.-র যুগে এরূপ ঘটনা ঘটলে তিনি তো উল্টো নিয়োগকর্তাকেই শাস্তি দিতেন।

(২) বেকার সমস্যা ঃ বাংলাদেশে শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত বিরাট জনগোষ্ঠী বেকারত্বের শিকার। আমাদের সমাজে অপরাধমূলক ঘটনার পেছনে এ কারণটিও বিদ্যমান। এ অবস্থায় চুরির কঠোর দণ্ড দেয়া যায় না, এমনকি সাধারণ দণ্ড প্রদান করাও বিবেক বিরুদ্ধ।

(৩) **দুর্ভিক্ষ ঃ** দেশে দুর্ভিক্ষ চলাকালে অন্নকষ্টে কেউ চুরির অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দেয়া যায় না। এটা ইসলামী আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। মহানবী স. বিত্তবান লোকদেরকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনগণের আহারের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

عن ابى موسى الاشعرى عن النبى ﷺ قال اطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العانى.

"আবূ মূসা আল-আশআরী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, তোমরা দুর্ভিক্ষ পীড়িতকে আহার করাও, রুগ্নের সাথে দেখা-সাক্ষাত করো এবং বন্দীকে মুক্তি দাও।" [৩০]

হযরত উমার রা.-র খেলাফতকালে হাতিব রা.-র দাসগণ মুযায়না গোত্রের এক ব্যক্তির একটি উষ্ট্রী চুরি করে যবেহ করে (আহার করে)। বিষয়টি উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-র নিকট উত্থাপিত হলো। উমর রা. দাসদের হাত কাটার জন্য কাছীর ইবনুস-সাল্‌ত রা.-কে নির্দেশ দেন। অতঃপর উমর রা. রায় স্থগিত করে হাতিবকে বলেন, মনে হয় তুমি তাদেরকে অনাহারে রাখো। পুনরায় তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে কঠোর জরিমানা করবো। তিনি উষ্ট্রীর মালিককে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার উষ্ট্রীর দাম কতো? মুযানী বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি চার শত দিরহামেও এটি বিক্রি করিনি। উমর রা. হাতিবকে নির্দেশ দিলেন, তুমি মুযানীকে আট শত দিরহাম প্রদান করো।[৩১]

(৪) সর্বোপরি ইসলামী শরীয়ত আইন জারীর করার পূর্বে জনগণকে আইন মেনে চলার মানসিকতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলে, তাদেরকে ইসলামী জীবনধারায় অভ্যস্ত করার প্রশিক্ষণ দেয়, শরীয়তের পর্যাপ্ত জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তার নীতিবোধকে জাগ্রত করে, শানিত করে, যার ফলে সে নিজ থেকেই বিবেকের তাড়নায় আইন মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ হয়। সাথে সাথে যেসব কারণে মানুষ চুরি করতে বাধ্য হয় সেসব কারণ দূরীভূত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। এরূপ একটি সামাজিক ও নৈতিক পরিবেশ গড়ে তোলার পর কঠোর শাস্তির বিধান জারী করা হয়। যাতে মানুষ জান-মালের নিরাপত্তাসহ শান্তিতে বসবাস করতে পারে। এ হলো শাস্তি সংক্রান্ত বিধান (হুদূদ) জারী করার পূর্ব-শর্ত (কনটেক্সট)। আইন জারীর ক্ষেত্রে এসব শর্ত উপেক্ষা করা যায় না।

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের নৈতিক চেতনাবোধ, পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার মনোভাব এবং ধর্মের অনুশাসন সম্পর্কে অজ্ঞতা বা জিহালত আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। বিশেষ করে ধনিক ও আধুনিক শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত শ্রেণীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতি মমত্ববোধ, সহানুভূতি ও

সহযোগিতার মনোভাব বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গীই হলো, 'আয় করো, ভোগ করো'। এই অবস্থায় ব্যাপক নৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটানো ছাড়া ইসলামের কঠোর বিধান জারি করা স্বয়ং ইসলামই সমর্থন করে কিনা তা ভেবে দেখার বিষয়।

তথ্যনির্দেশিকা

১. বুখারী, হুদূদ, বাব ২২ ঃ লা ইউরজামুল মাজনূন; আবূ দাঊদ, হুদূদ, নং ৪৩৯৮; তিরমিযী, ঐ, বাব ১, নং ১৪২৩; ইবনে মাজা, তালাক, বাব ১৫, নং ২০৪১; দারিমী, হুদূদ, বাব ১, নং ২২৯; নাসাঈ, তালাক, বাব ২১, নং ৩৪৬২।

২. নাসাঈ, কাতউস-সারিক, বাব ১১, নং ৪৯৬০; ইবনে মাজা, হুদূদ, বাব ২৮, নং ২৫৯৬।

৩. মুসনাদ আহ্মাদ, ২খ, পৃ. ২০৪, নং ৬৯০০।

৪. The penal Law of Islam.

৫. আবূ দাঊদ, হুদূদ, বাব ৯, নং ৪৩৮০; নাসাঈ, কাতউস-সারিক, বাব ৩, নং ৪৮৮১; ইবনে মাজা, হুদূদ, বাব ২৯, নং ২৫৯৭; মুসনাদ আহমাদ, ৫খ., পৃ. ২৯৩, নং ২২৮৭৫; দারিমী, হুদূদ, বাব ৬, নং ২৩০৩।

৬. নাসাঈ, দিয়াত, বাব ৪৬, নং ৪৮৬১; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক (র), কিতাবুল উকূল, বাব ১, নং ১।

৭. সূরা আল-মাইদা, আয়াত নং ৩০।

৮. কিতাবুল ফিক্হ আলাল-মাযাহিবিল আরবাআ, ৫খ., সারিকা অধ্যায়।

৯. সুনান আন-নাসাঈ, কাতউস-সারিক, বাব ৫, নং ৪৮৮৫-৮৮; ইবনে মাজা, হুদূদ, বাব ২৮, নং ২৫৯৫; আবূ দাঊদ, হুদূদ, বাব ১৫, নং ৪৩৯৪; সুনান আদ-দারিমী, হুদূদ, বাব ৩, নং ২২৯৯; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক (র), হুদূদ, বাব ৯, নং ২৮।

১০. নাসাঈ, কাতউস সারিক, বাব ৫, নং ৮৮৯-৯০।

১১. সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল হুদূদ, বাব ১২, নং ৬৭৮৮; মুসলিম, হুদূদ, বাব ২, নং ৪৪১১/৯; আবূ দাঊদ, হুদূদ, বাব ৪, নং ৪৩৭৩-৪; তিরমিযী, হুদূদ, বাব ৬, নং ১৪৩০; নাসাঈ, সারিক, বাব ৬, নং ৪৮৯৮-৪৯০৭; ইবনে মাজা, হুদূদ, বাব ৬, নং ২৫৪৭-৮; সুনান আদ-দারিমী, হুদূদ, বাব ৫, নং ২৩০২।

১২. নাসাঈ, কাতউস সারিক, বাব ৮, নং ৪৯১৬-৭।

১৩. মুওয়াত্তা ইমাম মালেক (র), কিতাবুল হুদূদ, বাব ১০, নং ৩০।

১৪. মুওয়াত্তা ইমাম মালেক (র), কিতাবুল হুদূদ, বাব মা ইয়াজিবু ফীহিল কাতউ, নং ২৩।

১৫. সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুদ দিয়াত, (২১) বাব ইযা আসাবা কাওমুন মিন রাজুলিন হাল ইউআকিবু আও ইয়াকতাস্সু মিনহুম কুল্লিহিম (তারজুমাতুল বাব)।

১৬. আবূ দাঊদ, হুদূদ, বাব ২১, নং ৪৪১০।
১৭. সহীহ বুখারী, দিয়াত, বাব ৬, নং ৬৮৭৮; সহীহ মুসলিম, বাব ৬, নং ৪৩৭৫/২৫, ৪৩৭৭/২৬; আবু দাঊদ, হুদূদ, বাব ১, নং ৪৩৫২; তিরমিযী, হুদূদ, ১৫, নং ১৪৪৪ নং হাদীসের অধীন; নাসাঈ, তাহরীমুদ-দাম, বাব ৫, নং ৪০২১-৪০২৪; দারিমী, সিয়ার, বাব ১১, নং ২৪৪৭; হুদূদ, বাব ২, নং ২২৯৭-৮; ইবনে মাজা, হুদূদ, বাব ১, নং ২৫৩৩-৪; মুসনাদ আহমাদ, ১খ., পৃ. ৬১, নং ৪৩৭।
১৮. শামসুল হক আজীমাবাদী, আওনুল মা'বূদ শারহু সুনান আবী দাঊদ, ৪খ., পৃ. ২৪৭-৮, উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যাধীন, মুলতান তা.বি.।
১৯. আহমাদ ফাতহী বারানযী, আল-হুদূদ ফিল-ইসলাম, পৃ. ৬৬।
২০. আল-কাসানী, বাদাইউস-সানই', ৭ম খণ্ড, পৃ. ৭৫।
২১. পূর্বোক্ত বরাত, পৃষ্ঠা ৬৯; আল-মাবসূত লিস-সারাখসী, ৯খ., পৃ. ১৫।
২২. আবূ দাঊদ, হুদূদ, বাব ১৯, নং ৪৪০৮।
২৩. আবূ দাঊদ, হুদূদ, বাব ১৪, নং ৪৩৯১।
২৪. পূর্বোক্ত বরাত, নং ৪৩৯৩।
২৫. পূর্বোক্ত বরাত, নং ৪৩৯২; নাসাঈ, কাতউস-সারিক, বাব ১৩, নং ৪৯৭৪-৭৯।
২৬. ডাকাতির শাস্তির জন্য দ্র. সূরা মাইদা, ৩৩ নং আয়াত।
২৭. আবূ দাঊদ, হুদূদ, বাব ৭, নং ৪৩৮৮; তিরমিযী, হুদূদ, বাব ১৯, নং ১৪৪৯; নাসাঈ, কাতউস-সারিক, বাব ১৩, নং ৪৯৬৪-৭৩; ইবনে মাজা, হুদূদ, বাব ২৭, নং ২৫৯৩-৪; দারিমী, হুদূদ, বাব ৭, নং ২৩০৪-৬; মুওয়াত্তা, হুদূদ, বাব ৩২; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৩খ., পৃ. ৪৬৩।
২৮. নাসাঈ, কাতউস-সারিক, বাব ১১, নং ৪৯৬০।
২৯. সূরা আল ইমরান, ১৪ নং আয়াত।
৩০. সহীহ বুখারী, কিতাবুল আতাইমা, বাব ১, নং ৫৩৭৩; সুনান আদ-দারিমী, কিতাবুস-সিয়ার, বাব ২৭, নং ২৪৬৫; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৪খ., পৃ. ৩৯৪, নং ১৯৭৪৬, পৃ. ৪০৬, নং ১৯৮৭৪।
৩১. মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, কিতাবুল আকদিয়াহ, বাব ২৮, নং ৩৮।

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ঃ ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ১৯, পৃষ্ঠা ঃ ৪৩-৭৮

ইসলামী আইনে জনসমাজের নিরাপত্তা ঃ বিধান ও প্রণোদনা

ড. মোঃ আনসার আলী খান

আল্লাহ্ তাআলাই এই বিশ্ব জাহানের সব কিছুর মালিক সৃষ্টিকর্তা, পালন কর্তা, নিয়ন্ত্রক। তিনি এ সব কিছু উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ বলেন : 'আল্লাহ তাআলা এই বিশ্ব জগতের সব কিছু (খেলার ছলে নহে, বরং) স্পষ্ট উদ্দেশ্য-সম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন।' - আল-কুরআন, সূরা ইউনুসঃ ৫

'আমরা আসমান ও জমিনকে এবং দু'য়ের মাঝখানে যা কিছু আছে অনর্থক সৃষ্টি করিনি।' আল কুরআন, সূরা রাদ : ২৭

উপরোক্ত আয়াত থেকে পরিষ্কার প্রতীয়মাণ হয় যে আল্লাহ্ অনর্থক বা উদ্দেশ্যহীন এই বিশ্ব জগতের কিছুই সৃষ্টি করেননি। এখন প্রশ্ন : কি উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তাআলা এই বিশ্ব জগত সৃষ্টি করেছেন?

এই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ 'আসমান সমূহ ও যমিনে (যেখানে) যা কিছু আছে তারা সবাই ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, আল্লাহ্ তাআলাকে সেজদা করে চলেছে, (এমন কি) সকাল সন্ধ্যায় তাদের ছায়াগুলোও (তাদের মালিকের সামনে সেজদা করছে)।' আল কুরআন, সূরা আর রা'দ, ১৫।

এখানে 'সেজদা' অর্থ আল্লাহর কাছে আনুগত্য প্রদর্শন, যা দাসত্বের বা আনুগত্যের সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ। এ ক্ষেত্রে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক অভিব্যক্তি দ্বারা বাধ্যতামূলকভাবে আনুগত্যকে নির্দেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ সকল সৃষ্টিই বাধ্যতামূলক ভাবে আল্লাহর আনুগত্য করে চলেছে। তাদের আনুগত্যের ক্ষেত্রে কোনই ব্যত্যয় বিচ্যুতি বা বিরোধ নেই। সৃষ্টিক্ষণ থেকে প্রলয় দিবস পর্যন্ত তারা আল্লাহর দেয়া নির্ধারিত বিধান মোতাবেক আনুগত্য করে চলবে।

আল্লাহ্ তাঁর আনুগত্যের ক্ষেত্রে অন্যান্য সৃষ্টি থেকে মানব জাতির বেলায় একটু ভিন্ন নীতি ও কৌশল অবলম্বন করেছেন। মানুষকে তাঁর আনুগত্যের বিষয়ে পরীক্ষা করতে

লেখক : সাবেক বিভাগীয় প্রধান, ল' বিভাগ, আই-আই-ইউ-সি, ঢাকা ক্যাম্পাস।

চান। আল্লাহ্ বলেন: 'আমি জিন ও মানুষকে কেবল এই জন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার বন্দেগী করবে।' - আল কুরআন, সূরা যারিয়াহ: ৫৬।

'সেই আল্লাহ তোমাদেরকে (মানবজাতি) প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তোমাদের ভেতর থেকে কাউকে কারোর চাইতে উঁচু মর্যাদা দিয়েছেন। যেন তিনি তোমাদেরকে যা কিছু দান করেছেন তার ভেতর তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন।' -আল কুরআন, সূরা আনয়াম: ১৬৫।

'আমি তাকে (এই দুনিয়ায় চলার) পথ দেখিয়েছি, তখন সে চাইলে হেদায়েতের পথে চলে আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পারে। আবার চাইলে (বিরোধিতার পথে চলে অকৃতজ্ঞ) কাফের হয়ে যেতে পারে।' - আল কুরআন, সূরা আদ দাহর-২।

উপরোক্ত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ মানব জাতিকে অন্যান্য সৃষ্টির মতোই আনুগত্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তবে অন্যান্য সৃষ্টির আনুগত্য থেকে মানব জাতির আনুগত্যের বিষয়টি একটু ভিন্ন প্রকৃতির। আর তা হলো অনুগত্যের বিষয়ে পরীক্ষা এবং প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব। মানুষ এই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে স্বেচ্ছায় আল্লাহর দেয়া আনুগত্যের বিধান মোতাবেক আনুগত্য তথা এবাদত করবে। তদপ্রেক্ষিতেই মানুষকে যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তা অর্জিত হবে।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সকল সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন তথা প্রবর্তন করেছেন। একে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বা Safety system বলা যেতে পারে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা অর্থ সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্জনে ফলপ্রসূ ভাবে যে সব উপায় উপাদান প্রয়োজন তার যথাযথ যোগান পূর্বক তা সুষ্ঠু ভাবে ব্যবহারের বিধানাবলী প্রদান।

মানুষ ছাড়া সকল সৃষ্টির নিরাপত্তা ব্যবস্থা বা Safety system অর্থাৎ আনুগত্যের উপায় উপাদান ও তা ব্যবস্থাপনার বিধান সয়ংসম্পূর্ণ বিধায় তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় কোন বিচ্যুতি ঘটে না।

কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ব্যত্যয় তথা বিচ্যুতি মারাত্মক ভাবে পরিদৃষ্ট হয়। মানুষকে আল্লাহ্ আনুগত্যের জন্য নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় সকল উপায় উপাদান ও তা ব্যবহারের বিধানাবলী যথাযথ ভাবে যোগান দিয়েছেন। আনুগত্যের পরীক্ষা জনিত কারণে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা প্রদান করায় মানুষ আনুগত্যের উপায় উপাদান সমূহ আল্লাহর দেয়া বিধান মোতাবেক ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া অবলম্বন না করায় নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়ে থাকে। সুতরাং এ থেকে বলা যায় যে, আল্লাহর আনুগত্যের জন্য আল্লাহর দেয়া উপায়-উপাদান বিধান আল্লাহর মোতাবেক ব্যবহার না করার কারণে মানুষের নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ বলেন: 'জলে-স্থলে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে তা মানুষের হাতের কামাই।' সূরা আর রুম ঃ ৪১।

ইসলামী আইনে জনসমাজের নিরাপত্তা বিষয়ে নিম্নে আমরা আলোচনার প্রয়াস পাব-ইনশাআল্লাহ।

১. ইসলামী আইন কি?

২. নিরাপত্তা কি?

৩. ইসলামী আইনে জন সমাজের নিরাপত্তার বিধান কি?

এক. ইসলামী আইন কি?

ইসলামী আইন কি? তা জানার আগে আইন বলতে সাধারণতঃ কি বুঝায় তা জেনে নেয়া সমীচীন।

আভিধানিক অর্থে আইন হলো আনুষ্ঠানিক বা প্রথাগত কতিপয় বিধি বিধান যা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং ইহার নাগরিকদের উপর বাধ্যকর। অন্য ভাবে বলতে গেলে; The word law refer to the rules that men have enacted to govern the community and to regulate personal, national and International relations." অর্থাৎ কোন জনসমষ্টির আচরণ পরিচালনা এবং ব্যক্তিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ বিধি বিধানকেই আইন বলে। এক কথায় মানব আচরণকে সামষ্টিক কল্যাণার্থে পরিচালনার জন্য প্রণীত নিয়ন্ত্রণ বিধি-বিধানই আইন।

ইসলামী আইন কি? মানব রচিত আইন থেকে ইসলামী আইনের অভিব্যক্তি অধিক বিস্তৃত, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও প্রয়োগিক প্রকৃতির। সার্বিক অর্থে ইসলামী আইনকে শরীয়ত (Sharia) বলা হয়। 'শরীয়ত' শব্দটি আভিধানিক অর্থে সেই পানি বোঝায়, যেখানে পিপাসার্তরা একত্রিত হয় এবং তা পান করে পিপাসা নিবারণ করে।

ব্যবহারিক অর্থে শরীয়ত অর্থ: এক সুদৃঢ় ঋজু পথ, যদ্বারা তার অবলম্বনকারী লোকেরা হেদায়েত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মপথ লাভ করতে পারে। এ দু'টি জিনিসই (হেদায়েত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্ম পথ) মানুষের পিপাসা নিবৃত করে বলে এ দু'য়ের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সাদৃশ্য স্পষ্ট।

ফিকহ্‌বিদদের দৃষ্টিতে 'শরীয়ত' বলতে বুঝায় সে সব আদেশ নিষেধ ও পথ নির্দেশ যা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি আনুগত্যের বিধান হিসেবে জারী বা প্রবর্তন করেছেন। এটি এ জন্য করেছেন যাতে লোকেরা তাঁর প্রতি ঈমান এনে তদনুযায়ী আমল করে এবং তদনুরূপ জীবন যাপন করে। এই আদেশ নিষেধ ও নির্দেশ হতে পারে আকীদা বিশ্বাস পর্যায়ের, চরিত্র ও নৈতিকতা পর্যায়ের এবং কর্ম পর্যায়ের, যার মাধ্যমে সকল মানুষের নিরাপত্তা সুদৃঢ় ও নিশ্চিত হয়।

আল্লাহর এ আদেশ নিষেধ নির্দেশ সমন্বিত বিধান (শরীয়ত) অত্যন্ত দৃঢ় ও সুষ্ঠু। মানুষের হৃদয়, মত, জীবন ও বিবেক বুদ্ধির পরিচর্যা ও চরিতার্থতার এই হচ্ছে একমাত্র পথ। একে দীনও বলা হয়ে থাকে।

শরীয়ত আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো:

বিশ্ব-মানব সমাজকে যথেচ্ছাচার ভুল-ভ্রান্তি ও কামনা লালসার হাতছানি থেকে মুক্ত করে সত্য, সুবিচার ও ন্যায়ের দিকে নিয়ে আসা, যেন পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বপূর্ণ কাজটি সঠিক ও সুষ্টু নিয়মে কার্যকর ও বাস্তবায়িত হতে পারে। কেননা এ বিধান অত্যন্ত সুদৃঢ়, সুষ্ঠু ও ঋজু। এতে বক্রতা বলতে কিছু নেই, শরীয়তের নির্দেশনা মতো চললে কারো বিভ্রান্ত ও পথ ভ্রষ্ট হবার কোনই আশংকা থাকে না। স্বাধীন, সুদৃঢ় জীবন যাপনের এটাই একমাত্র পথ। মানব জাতির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সকল প্রকার নিরাপত্তা বিধান এতে নিহিত।

আল্লাহ্ তাআলা এই শরীয়াহর বিধান দিয়েই তাঁর নবী ও রাসূলগণকে এই দুনিয়ার মানুষের নিকট প্রেরণ করেছেন।

শরীয়ত তথা ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্যাবলী

ইসলামী শরীয়ত তথা আইনের বহুবিধ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান; তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হলো:

১. ইসলামী আইন সম্পূর্ণ আল্লাহর আনুগত্যের ইনসাফ পূর্ণ নির্দেশ। এতে ন্যূনতম জুলুমের চিহ্ন নেই। মানব রচিত আইনে যে আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয় তাতে কোন না কোন প্রকার জুলুম থাকে বলে তা ইনসাফ পূর্ণ হয় না বা হতে পারে না। আর একারণেই মানব রচিত আইনে প্রকৃত জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের কারণে জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরনে যে আইন আবশ্যক তাহলো 'ইনসাফ' (Justice)। ইনসাফ এবং আইন এক নয়। আইনের মাধ্যমে ইনসাফ কার্যকরী হয়ে থাকে।

ইনসাফ (Justice) শব্দটি ল্যাটিন 'Justifia' শব্দ থেকে নির্গত। শব্দটি মানুষের ব্যক্তিক ও সামাজিক সম্পর্কের নেটওয়ার্কের প্রেক্ষিত নির্দেশক। একজন ব্যক্তির সাথে অপর একজন ব্যক্তি পরস্পর কি ভাবে সম্পর্কিত হয় তা নির্দেশ করে। একজন ব্যক্তিকে তখনই ইনসাফ বাদী বলে অভিহিত করা ইনসাফ হয়, যখন সে ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে সঠিক সম্পর্ক স্থাপনে নিদর্শন স্থাপন করে। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি তার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান পূর্বক তার অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সক্ষম হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে প্রত্যেককে তার ন্যায্য পাওনা প্রদান করাই হলো ইনসাফ।

(A person is said to be just when he/she stands in right relationship with others, that is, when he/she recognizes others as persons and respect their rights. In other words, to be just

means to give each one what is due to him (her as a person).
ইসলামী আইনে ইসসাফের নিকটবর্তী শব্দ আদল, ইহ্‌সান ও ছেলায়ে রেহমী। এই শব্দ তিনটির মধ্য দিয়েই ইনসাফের পূর্ণাঙ্গ রূপ বিকশিত হয়।

আদল ঃ 'আদল' শব্দটি মূলত দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি হলো সৃষ্টি জগতের পারস্পরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য রক্ষা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রত্যেককে তার ন্যায্য অধিকার যথাযথভাবে আদায় করে দেয়ার ব্যবস্থা করা। সত্যি কথা বলতে কি, একেই প্রকৃত ইনসাফ বলে। সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনে প্রকৃত নিরাপত্তা নিশ্চিত করনে ইনসাফপূর্ণ আইন অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

ইহ্‌সান ঃ 'ইহ্‌সান' অর্থ হলো ভাল ব্যবহার। সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ, উদারতা, কাউকে ন্যায্য অধিকার প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান। এক জনের প্রতি অপরজনের দায় ও শ্রদ্ধাবোধ।

'আদল' থেকে ইহ্‌সানের অনুশীলন অতিরিক্ত বিষয় নির্দেশক। তাই সামাজিক জীবনে আদল থেকে ইহ্‌সানের গুরুত্ব বেশী। আদল হলো সমাজের ভিত, আর ইহ্‌সান হলো উদার সৌন্দর্য্য এর পূর্ণতা। আদল যদি হয় সমাজের অসন্তোষ ও তিক্ততা হতে রক্ষা করা, তাহলে ইহ্‌সান হবে শুভ্রতা, স্বচ্ছতা, সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও পবিত্র ভাব ধারার প্রবাহ।

যদি কোন সমাজে আদল অনুশীলন হয় তাহলে কাটায় কাটায় অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আন্তরিকতা, বৈরিতা অকল্যাণ কামনা থাকবে না। এ জন্য আদলের সাথে সাথে ইহ্‌সানও থাকতে হবে। আদল ছাড়া সমাজে, শান্তি, সম্প্রীতি, ভালবাসা থাকে না। আর এজন্যই কোন সমাজে প্রকৃত নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সম্প্রীতি, আন্তরিকতা, বদান্যতা, কল্যাণ কামনার ন্যায় ইহ্‌সানের অনুশীলন জরুরী।

ছেলায়ে রেহ্‌মীঃ এর অর্থ নিকট সম্পর্কের প্রতিদরদী সাহায্যকারী ও দায়িত্বশীল হওয়া। কোন সৃষ্টির অস্তিত্ব রক্ষায় এর ভূমিকা অপরিসীম। ইসলামী আইনে এ তিনটি বিষয় সম গুরুত্ব সহকারে স্থান লাভ করেছে, যা মানব রচিত আইনে চিন্তাও করা যায় না। মানব রচিত আইনের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আদল, ইহ্‌সান ও ছেলায় রেহ্‌মীর প্রয়োজন, তা মূলতঃ ইসলাম থেকেই গ্রহণ করতে হবে।

২. ইসলামী আইন একটি সমন্বিত নৈতিক বিধান। মানব রচিত আইনের মতো ইসলামী আইন নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য করে না এবং তা নৈতিকতা বর্জিতও নয়। কেননা নৈতিকতা মানব চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানব রচিত আইনে চরিত্রের কোন স্বীকৃতি নেই। চরিত্রের বিষয় বিবেচনা ছাড়া তা

উত্তম চরিত্রের প্রত্যাশা করে। আল্লাহ পাক মানব জাতিকে তাদের উত্তম চরিত্র গঠনের মাধ্যমে মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধকে সুদৃঢ় ও মজবুত করতে চেয়েছেন বলেই শরীয়তের মধ্যে এ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে স্থান পেয়েছে।

৩. ইসলামী আইন পূর্ণাঙ্গ ও সর্বজনীন। মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত এই পৃথিবীর জীবনে যা যতটুকু আইন প্রয়োজন তা সর্বকালের সকল মানুষের জন্য তিনি অবতীর্ণ করেছেন।

৪. ইসলামী আইন অর্থ বাস্তবমুখী বিধান। এই পৃথিবীর জীবনে মানুষের বাস্তবসম্মত যা যা প্রয়োজন, তা কি ভাবে পূরণ সম্ভব তা এতে উল্লেখিত হয়েছে। ইসলামী আইনের বাস্তব অনুশীলন নবী মুহাম্মদ স. এর সমগ্র জীবনে পরিদৃষ্ট হয়। আর এজন্যই নবী স.-এর জীবন মানেই ইসলামী আইনের বাস্তব নিদর্শন। পৃথিবীর মানুষের তৈরী আইনের ক্ষেত্রে এর কোনই তুলনা হয় না। মানুষের তৈরী আইন অধিকাংশই অনুমান নির্ভর। তাই তা বাস্তবায়নে পদে পদে নানাবিধ প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়।

৫. ইসলামী আইন সংহতি ও সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং উপযোজনমূলক। এটি পরস্পর নির্ভরশীল সমাজবদ্ধ মানুষের সংহতিপূর্ণ সহাবস্থান, সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ এবং পরস্পরের সহযোগিতার ক্ষেত্রে সুন্দর উপযোজন ব্যবস্থাপূর্ণ বিধান। এতে একজন মুসলিমের সাথে একজন অমুসলিমের লেনদেন, কারবার কিভাবে সম্পাদিত হবে তা বলে দেয়া হয়েছে। মানুষের স্বভাবজাত কারনে কোন অধিকার আদান প্রদানের ক্ষেত্রে কখনো সাংঘর্ষিক অবস্থার অবতারনা হলে সৌহাদ্য পূর্ণ উপায়ে তা সুরাহার ব্যবস্থা ইসলামী আইনে রয়েছে।

৬. ইসলামী আইনের মৌলিক বিষয়াবলী কেবলমাত্র অপরিবর্তনীয় আর অবশিষ্ট সকল বিধানই অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিবর্তনযোগ্য। ইসলামী আইনের যে সব বিধানে কোন পরিবর্তন ও পরিবিধান বা সংকোচন নেই, যেগুলো স্থির ও দৃঢ়বদ্ধ। স্থান-কাল পরিবর্তনে তাতে কোন পরিবর্তন ঘটে না। ইমাম ইবনে কাইয়েম তাঁর **'ইগাছাতুল লাহকান'** গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ফরয, ওয়াজিব, হারাম, শরীয়ত নির্ধারিত অপরাধের দন্ডবিধি এবং এ জাতীয় অন্যান্য যে সব বিষয় সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, তা ইজতেহাদ দ্বারা পরিবর্তন করা যায় না। অন্যদিকে স্থান-কাল ও অবস্থার পরিবর্তনে মানবতার কল্যাণের স্বার্থে যার পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়ে তা পরিবর্তন করা যায়। যেমন অনুমান ভিত্তিক পরিমাণ ও তার গুণাবলী। এ প্রসঙ্গে তাযিরের আওতায় শাস্তি র কথা বলা যেতে পারে। নতুন ঘটনাকে ইসলামী আইনের সাথে খাপ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে তার পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্য সত্যিই সংঘাতপূর্ণ। অথচ মানব রচিত আইনের ভিত্তি অত্যন্ত ভঙ্গুর। তাতে কোন স্থায়ী নীতির নির্দেশনা নেই। অথচ মানুষের অনেক

অবস্থাই অপরিবর্তনীয়। মানুষের এ স্বভাব জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত অভিন্ন থাকে। মানুষের আচরণ অবস্থার পরিবর্তনের দরুন যতটুকু পরিবর্তনশীল, ইসলাম সেক্ষেত্রে পরিবর্তনের অবকাশ দিয়ে আইনকে যুগোপযোগী করার জন্য ইজতিহাদ বা গবেষণার অবকাশ রেখেছে।

৭. ইসলামী আইনের আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এটি সীরাতুল মুস্তাকীম যা ইহকাল ও পরকালের মুক্তি ও কল্যাণের পথ নির্দেশক। এর প্রধানতম উৎস ওহী এবং এর সংরক্ষক স্বয়ং আল্লাহ পাক। সমগ্র বিশ্বের মানুষ একযোগে চেষ্টা করেও এর বিনাশ সাধন করতে পারবে না। ইসলামী আইন অনুসরনে মানবজাতির নিরাপত্তা ও শান্তি এবং এর বিরোধিতায় মানব জাতির অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতা।

মানব রচিত আইনে এরূপ কোনই বৈশিষ্ট্য নেই। মানব রচিত আইন সর্বদা বক্র পথে চলে বলে একটি অকল্যাণকর অবস্থার অবসান ঘটানোর জন্য অপ্রতুল আইন প্রণয়ন করে আর একটি অকল্যাণকর অবস্থার অবতারনা ঘটায়। বস্তুত একারণেই মহান আল্লাহ মানব রচিত আইনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন, "এরা বিভ্রান্তির ধূম্রজালে আবর্তিত হয়।"

দুই. জন নিরাপত্তা (Public Safety) কি? 'জন নিরাপত্তা' প্রত্যয়টি খুবই বিস্তৃত এবং তাৎপর্য মন্ডিত। জন নিরাপত্তা বিষয়টি মূলতঃ দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। জন+নিরাপত্তা। শব্দ দু'টি পৃথক ভাবে বিশ্লেষণ করলে এর প্রতিপাদ্য বিষয় সহজে অনুমেয় হবে। নিম্নে শব্দ দু'টি বিশ্লেষিত হলোঃ

প্রথমতঃ 'জন' (Public): সহজ অর্থে কোন সমাজে বসবাসকারী জনসাধারণকে জন বা পাবলিক বলে। আভিধানিক অর্থে কোন রাষ্ট্রীয় সমাজে বসবাসকারী জন সমষ্টি যারা সরকারের সেবা সুবিধাদি (সার্ভিসেস) ভোগ ব্যবহার করে। জন বলতে এখানে সাধারন্যে প্রচলিত অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সমাজ বিজ্ঞানে জনসাধারণ (পাবলিক) বলতে কোন সমাজে বসবাসকারী বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য মন্ডিত জনগণকে নির্দেশ করে। যেমন বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন লিঙ্গের, বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন বংশের, বিভিন্ন শিক্ষার সমষ্টিকে বুঝায়।

The term 'public' refers to great mass of persons living in a community or area having different features and interests.

'পাবলিক' শব্দটি দ্বারা নির্দেশিত জনসমষ্টিকে তাদের বৈচিত্র্য বৈশিষ্ট্যের দরুন কোনরূপ প্রভেদ করা হয় না। কেননা তদ্বারা পাবলিক এর প্রকৃত spirit রহিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ নিরাপত্তা (safety)ঃ 'নিরাপত্তা' শব্দটির অর্থ বিস্তৃত। সহজ অর্থে নিরাপত্তা অর্থ সম্ভাব্য বিপদ থেকে রক্ষা করা বা নিবারিত করা। To protect from danger

or harm. It means a measure taken against any harm or danger of the mankind.

এখানে নিরাপত্তা বলতে মানুষের জীবন ও অধিকার সংরক্ষণের জন্য গৃহীত কার্যকর ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। সমাজে বসবাসকারী বৈচিত্র্য স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত মানুষের সংরক্ষণ, শৃঙ্খলা ও বিকাশ ধারা সমুন্নত করণের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পৌছানোর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও উপায় নিশ্চিত করণ ব্যবস্থাপনাই হলো নিরাপত্তা, যাতে সমাজের কোন মানুষ তার সুষ্ঠু জীবন ধারায় কোনরূপ হুমকী, ভীতি, ক্ষতিকর কোন পরিস্থিতির শিকার না হয়।

সহজ অর্থে সমাজের মানুষের সকল প্রকার অধিকারের নিশ্চিত ব্যবস্থাকরণকেই নিরাপত্তা বলে।

জননিরাপত্তা হলো একটি রাষ্ট্রীয় সমাজে বসবাসকারী সকল মানুষের সকল অধিকার নিশ্চিত করণের যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বনপূর্বক তাদের স্বাভাবিক প্রাত্যহিক জীবন প্রবাহের সুষ্ঠু সংরক্ষণ, শৃঙ্খলা ও বিকাশ ধারা (Protection, discipline and development) সমুন্নত করণ।

জননিরাপত্তার আঙ্গিক ও ক্ষেত্র বহুবিধ। তবে তা মানুষের অধিকার সুনির্দিষ্টকরণ ও তার পুরোপুরি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ইনসাফ সুবিচার ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্ভব। এক্ষেত্রে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত না হলে জননিরাপত্তা মারাত্মক ভাবে বিঘ্নিত হয়। মানব সমাজ তাদের কৃষ্টি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত আইন ব্যবস্থার মাধ্যমে নিরাপত্তার ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। আইন ব্যবস্থার প্রকৃতি ও পরিধি প্রেক্ষিতে সমাজের বসবাসকারীগণ মানুষের নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

জন নিরাপত্তার বলয়ভুক্ত বিষয়াবলী

কোন রাষ্ট্রীয় সমাজে জননিরাপত্তার বলয়ভুক্ত বিষয়গুলো জনগণের স্বার্থ তথা অধিকার রক্ষা ও সংরক্ষণ। (To protect and maintain the interests of human beings in the society).

জনগণের স্বার্থ ও অধিকার বলয়ের মধ্যে বহুবিধ বিষয় সম্পৃক্ত। পন্ডিতগণ একে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণে প্রয়াস পেয়েছেন। তবে নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলোঃ

ক. জীবন (life)
খ. সম্পদ (Property)
গ. স্বাধীনতা (freedom)
ঘ. বিশ্বাস ও আদর্শ (faith and ideology)

ঙ. বংশধারা (family)
চ. মান-সম্মান (honour) ইত্যাদি।

জননিরাপত্তার বিবেচ্য কার্যধারা

পন্ডিত ব্যক্তিদের মতে জননিরাপত্তার বিবেচ্য কার্য ধারা প্রধানতঃ দু'টি।
প্রথমত: জননিরাপত্তাভুক্ত বিষয়াবলীর যথাযথ সংরক্ষণ ও
দ্বিতীয়ত: সমাজের বসবাসকারী বৈচিত্র্য বৈশিষ্ট্য মন্ডিত মানুষের বৈচিত্র্য চাহিদা পূরণের মাধ্যমে স্বাভাবিক বিকাশ ধারা সমুন্নত করণে সম্পদের সুষম বন্টন প্রক্রিয়া অবলম্বন।

একে সংক্ষেপে Protective and Supportive activities বলা যেতে পারে। Protective activity এর মাধ্যমে অপরাধীদের থেকে জনগণের নিরাপত্তার বলয়ভুক্ত বিষয়গুলোকে রক্ষা করা হয় এবং Supportive activity এর মাধ্যমে সমাজে বসবাসকারী বিচিত্র মানুষের মধ্যে অক্ষম, অচল, দরিদ্র জনসাধারণকে তাদের চাহিদা পূরণে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হয়।

৩। ইসলামী আইনে জননিরাপত্তার বিধান ঃ

ক. পূর্ব কথা ঃ জননিরাপত্তা তথা মানুষের নিরাপত্তা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যানুগ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে নিহিত। এই কর্মকান্ডের প্রকৃতি ও পরিধি মানুষের দেহ-মন, তার বসবাস পরিবেশ ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত।

আল্লাহ পাক মানুষ জাতিকে একমাত্র তাঁরই আনুগত্য তথা ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর এই আনুগত্য বা ইবাদতে মানব জাতির নিরাপত্তা এবং আল্লাহর আনুগত্যের বিপরীতে মানুষের নিরাপত্তাহীনতা নিহিত।

আল্লাহ পাক মানুষ জাতিকে আনুগত্যের পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করে, তাকে আনুগত্য করা বা না করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। এ কারণেই কোন কোন মানুষ স্বেচ্ছায় আনুগত্য করে এবং কিছু কিছু মানুষ আনুগত্য না করে তার বিপরীত পাপ করে থাকে। মানুষের এই পাপমূলক কর্মকান্ডের ফলশ্রুতিতেই মানুষ সমাজ জীবনে নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়।

মহান দয়ালু আল্লাহ মানবজাতির নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং নিরাপত্তাহীনতা প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামী বিধি বিধানকে এমন ভাবে বিন্যাস করেছেন, যাতে মানব সমাজের পাপ মূলক কর্মকান্ড কার্যকর ভাবে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানুষের ইহ জীবন সহ পরকালীন জীবনে পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ সম্ভব।

জনজীবন তথা মানুষের জীবনের নিরাপত্তার অধিক্ষেত্র কেবল এই জগতেই পরিব্যাপ্ত নয়। এই পৃথিবীর জীবনকাল সমাপ্তির পর পরকালীন জীবনে এই পৃথিবীর জীবনে অনুসৃত পরিশীলিত নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার ফলাফল মারাত্মক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। পৃথিবীর জীবনে আল্লাহর অনুমোদিত নিরাপত্তার বিধান অনুসরণে এখানে

যেমন শান্তি ও নিরাপত্তা সুষ্ঠুভাবে কার্যকর হয়, তেমনি পরকালীন জীবনে আল্লাহর শান্তি ও নিরাপত্তার নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা রাখে। এর ব্যত্যয়ে অর্থাৎ এই পৃথিবীর জীবনে আল্লাহ্‌র অনুমোদিত নিরাপত্তার বিধান প্রত্যাখ্যানে মারাত্মক ভাবে অশান্তি ও চরম নিরাপত্তাহীনতার শিকার হতে হয়।

খ. ইসলামী আইনে জননিরাপত্তা বিধানের নীতি ও কৌশল ঃ মহান আল্লাহ্ জননিরাপত্তা তথা মানুষের নিরাপত্তা বিধান কল্পে কেবল ইসলামী বিধানই অবতীর্ণ করেননি, কিভাবে তা বাস্তবায়ন করে মানুষের জীবনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় তাও বলে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন: "বস্তুত আমি পাঠিয়েছি আমার নবী-রসূলগণকে এবং তাদের সাথে নাযিল করেছি কিতাব ও মানদন্ড- যেন লোকেরা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আরো নাযিল করেছি লৌহ। এর মধ্যে রয়েছে বিযুক্ত অনমনীয় শক্তি এবং জনগণের জন্য অশেষ কল্যাণ। আরো এ জন্য যে কে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অগোচরে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে তাকে যেন আল্লাহ জানতে পারেন।"- আল কুরআন সূরা আল হাদীদ ঃ ২৫।

এখানে লৌহ্ অর্থ রাজশক্তি, যে লোক কুরআনের হেদায়েত পেয়ে দীনের অনুসারী হবে না, রাষ্ট্রশক্তি তাকে গোমরাহী ও বিপর্যয় সৃষ্টির পথ থেকে বিরত রাখতে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে। নৌকার আরোহীরা ডুবে মারা যাক- এ উদ্দেশ্যে নৌকায় ছিদ্র করার অধিকার যেমন কাউকে দেয়া যেতে পারে না, ঠিক তেমনি সমাজে কোন ব্যক্তি তথা শক্তি বিপর্যয় ও পথভ্রষ্টতার পরিবেশ সৃষ্টি করুক, তার হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্যই প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র শক্তি তথা রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা।

কোন সমাজ তথা রাষ্ট্রে ইসলামী আইন প্রবর্তনের মাধ্যমেই সেই সমাজ তথা রাষ্ট্রের জনগণের পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব। অন্য কোন ভাবে নয়।

কি ভাবে একটি রাষ্ট্র ইসলামী আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে জনগণের নিরাপত্তা বিধান করতে পারে- বিষয়টি খুবই বিস্তৃত। এ পরিসরে তা সে ভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই আমরা বিষয়টি দু'টি শিরোনামে আলোচনার প্রয়াস পাব:

প্রথমতঃ মানুষকে সকল প্রকার পাপ কাজ অর্থাৎ অপরাধ থেকে মুক্ত রাখার কর্মপন্থা অবলম্বন; এবং

দ্বিতীয়তঃ সমাজের মানুষের প্রয়োজন পূরণের নিরাপত্তা বিধানের পদক্ষেপ গ্রহণ।

ইসলাম মানব জাতির সর্বাঙ্গীন নিরাপত্তা বিধানের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম মানব সমাজকে আল্লাহর আনুগত্যের পরিপন্থী কর্মকান্ড, যাকে পাপ বা অপরাধ বলা হয়, তা থেকে মুক্তকরণের প্রধানতঃ দু'ধরনের পন্থা অবলম্বন করেছেঃ

১। মানুষের মন মানসিকতার সংশোধণ ও পরিশুদ্ধকরণ, এবং

২। বাহ্যিক সংশোধন ও নিয়ন্ত্রণ।

প্রথমটি ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষকে তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং তা অর্জনের নীতি ও কৌশল সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ শিক্ষা দান প্রক্রিয়া অবলম্বনের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

দ্বিতীয়টি রাষ্ট্র শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অপরাধ নির্মূলের ব্যবস্থা অবলম্বন।

মানুষের মন মানসিকতার সংশোধন ও পরিশুদ্ধকরণ ঃ পাপ মানুষের শাস্তি ডেকে আনে। আর এই শাস্তিরই একটি নিরাপত্তাহীনতা। তাই মানুষের নিরাপত্তা, পাপ থেকে মুক্ত থাকার মধ্যে নিহিত। রাষ্ট্র মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত রাখার জন্য যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার আয়োজন করবে; তাতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে সম্পৃক্ত হবে।

ক) আল্লাহ্ সম্পর্কিত পাপ

এক. আল্লাহর সাথে শরীক করার কারণে সৃষ্টপাপ। এ পাপ থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহর গুণাবলী ও একত্ববাদ সম্পর্কে জ্ঞান দান করা আবশ্যক। সকল পাপের মধ্যে এটি সব থেকে বড় পাপ।

দুই. আল্লাহর সাথে কুফরী করার কারণে সৃষ্ট পাপ। এ পাপ সৃষ্টি হয় আল্লাহকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে। আল্লাহ্র দেয়া নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতার মধ্যেও এ পাপ নিহিত।

তিন. আল্লাহকে ভুলে থাকা একটি পাপ। বলা হয়েছে আল্লাহর স্মরণ শূন্য অন্তর মৃত্যুতুল্য। এ পাপ মানুষকে ধ্বংস সাধন করে।

চার. নিফাকের পাপ অর্থাৎ বিশ্বাস ও কর্মে বৈপরীত্য। এটি দু'ধরনের হতে পারে। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বৈপরীত্য একটি নিফাক যা কিনা মারাত্মক ও জঘন্য ধরনের পাপ।

অপরটি হলো কথা ও কাজের বৈপরীত্য। এ বিষয়ে কুরআনের সূরা বাকারার ৮-১২ আয়াতে বলা হয়েছে।

পাঁচ. রিয়া বা মানুষ দেখানো মনোভাব। আল্লাহকে সন্তুষ্টির জন্য নয় মানুষকে দেখানোর জন্য কোন ভাল কাজ করা। যেমন মানুষকে দেখানোর জন্য নামাজ পড়া, হজ্ব করা, দান ইত্যাদি। সূরা মাউন এর ৪-৬ আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

খ) পারিবারিক জীবনে পাপ

মানব জাতির পারিবারিক জীবনে নিরাপত্তা বিধান কল্পে আল্লাহ্ পাক যে বিধান দিয়েছেন, তা লংঘন বা অমান্য করাতে পাপ বা অপরাধ সাধিত হয়। এ বিষয়ে জনগণকে যথাযত শিক্ষা দান রাষ্ট্রের আবশ্যিক কর্তব্য। নিম্নে কতিপয় পারিবারিক পাপ সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো ঃ

- পিতা-মাতার সাথে অসদব্যবহার বড় গুনাহ। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন নিজের পিতা-মাতাকে গালি দেয়া সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ। পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত। -আল হাদিস।
- আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা বড় পাপ।
- সূরা বাকারার ২১৫ নং আয়াতে পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন ও মুসাফিরদেরকে অর্থ সম্পদ প্রদানের জন্য বলা হয়েছে।
- বুখারী শরীফে উল্লেখিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তার জীবিকার প্রাচুর্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখে।

গ) পানাহার ও খাদ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে পাপ

পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২১৯ নং আয়াতে মদ পান ও জুয়াকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। অনুরূপ সূরা আনয়ামের ১৭৩ নং আয়াতে মৃত জন্তুর রক্ত, শুকরের মাংস, যা যবাই করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি এমন জন্তুর মাংস হারাম করা হয়েছে। এ বিষয়টিও জনগণকে রাষ্ট্রের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে জ্ঞান দিতে হবে। এটি যেমন জনগনের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, তেমনি নৈতিক চরিত্রের ক্ষেত্রে। এদ্বারা মানুষ নিজে যেমন নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে, তেমনি অন্যকে নিরাপত্তাহীন করে তোলে।

ঘ) সামাজিক জীবনে কতিপয় মারাত্মক পাপ

ইসলাম মানব সমাজে জননিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নিশ্চিত ও সুদৃঢ় করণে মানুষের সামাজিক জীবনের এমন কতিপয় বিষয়কে পাপ বা অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করেছে, যার অনিবার্য ফলশ্রুতি জননিরাপত্তাহীনতা। কোন সমাজে এ বিষয় বিদ্যমান থাকলে সে সমাজে কখনো জননিরাপত্তা থাকতে পারে না। এগুলো সমাজের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। বিষয়গুলো হলো ঃ

১. জুলম
২. মন্দ কাজে পরস্পর বাধা না দেয়া।
৩. শত্রুর সাথে প্রতিরোধ বিমুখ থাকা।
৪. মিথ্যাচার
৫. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া
৬. চোগল খুরী করা
৭. কৃপণতা
৮. অন্যকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন না করা।

উপরোক্ত বিষয়গুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

১. যুলুম, অত্যাচার ঃ যুলুম অর্থ অত্যাচার বা সীমা লংঘন করা অর্থাৎ কোন বস্তু তার প্রকৃত স্থানে প্রয়োগ না করে অন্যত্র প্রয়োগ করা। ইসলামী পরিভাষায় ন্যায়ের বা

সত্যের সীমা লংঘন বা অন্যায় কাজের প্রতি আগ্রহকে যুলুম বুঝায়। ইসলামে যে যুলুম করে তাকে যালেম বলে। আল্লাহ কখনো কোন যালেমকে পছন্দ করেন না। অন্যের অধিকারে যে অন্যায় হস্তক্ষেপ করে সেই যালেম।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, 'যারা সীমা লংঘন করেছে, তাদের প্রতি ঝুকে পড়ো না, পড়লে অগ্নি তোমাদেরকে স্পর্শ করবে।'- সূরা হুদ ১১৩।

আল্লাহর রসূল স: বলেছেন: 'অত্যাচারিত ব্যক্তির দু'য়াকে ভয় কর, কেননা ঐ দু'আ এবং আল্লাহর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না।'- বুখারী ও মুসলিম শরীফ।

যুলুম থেকে রক্ষার জন্য সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যারা আল্লাহর দেয়া ন্যায় বিচারের বিধান আঁকড়ে না ধরবে তাদের জীবন যুলুমে পর্যবসিত হবে।

আল্লাহ বলেন: আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী যারা ফয়সালা না করে তারাই যালিম"- সূরা মায়েদা: ৪৫।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় জালিমের কোন স্থান নেই। এজন্য ইসলামী বিধানই সর্বাধিক জননিরাপত্তা বিধানে কার্যকর।

২. মন্দ কাজে পরস্পর বাধ না দেয়া ঃ পৃথিবীতে সেই সমাজের জনগণের নিরাপত্তা তথা কল্যাণ নিশ্চিত নয়, যে সমাজে পরকালের জবাবদিহিতার ব্যাপারে একে অন্যকে সাবধান না করে। এজন্য ইসলামের বিধান হলো সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজে বাধা দান করা।"

যে সমাজ সংকাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ না করে, ইসলাম সে সমাজকে অভিসম্পাতের উপযুক্ত পাপী সমাজ বলে আখ্যায়িত করেছে। ইসলামী সমাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন:

"বিশ্বাসী নর-নারী একে অপরের বন্ধু। এরা সৎকার্যের নির্দেশ করে এবং অসৎকার্যে নিষেধ করে"- সূরা তওবা: ৭১।

মুসলমানরা এ দায়িত্ব পালন করে থাকে বলে, মহান আল্লাহ্ বলেন: 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ দল, মানব জাতির জন্য তোমাদের অভ্যুদয় হয়েছে, তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর, অসৎ কার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর।'- আলে ইমরান: ১১০

ইসলামী আইনে কোন মন্দ কাজ যা জননিরাপত্তার জন্য হুমকী স্বরূপ দেখেও চুপ থাকা এবং তার প্রতিবাদ না করা কবীরা গুনাহ বা মহা অপরাধ।

রসূলুল্লাহ স.-এর হাতে সাহাবীগণ যে সব কাজে অঙ্গীকার করেন তার একটি হলোঃ 'আমরা যেখানেই থাকিনা কেন সত্য বলবো আর আল্লাহর ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করবো না। -বুখারী শরীফ। রসূলুল্লাহ স. আরো বলেন, "জালিম শাসকের সম্মুখে সত্য প্রকাশ করাই উত্তম জিহাদ"- আবু দাউদ।

৩. শত্রুর সাথে প্রতিরোধ বিমুখ থাকা ঃ শত্রুর সম্মুখে যুদ্ধে লিপ্ত না থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন

বা পলায়ন করা কবীরা গুনাহ। এরূপ গুনাহকারী নিজেকে দুইটি অনিবার্য শাস্তির দিকে নিয়ে যায়ঃ (ক) এই পৃথিবীতে আল্লাহর গজব এবং পরকালে দোযখের শাস্তি। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের সম্মুখীন হবে তখন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। যেদিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা স্বীয় দলে স্থান নেয়া ব্যতীত কেউ তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে সে তো আল্লাহর বিরাগভাজন হবে এবং তার আশ্রয় জাহান্নাম। সে কত নিকৃষ্ট স্থান"- সূরা আনফাল: ১৫-১৬।

একে ইসলাম জিহাদ বলেছে। জিহাদ হলো, অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম ইত্যাদির বিরুদ্ধে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে তা মিটিয়ে দেয়া। এ কারণে ইসলামী আইনে জিহাদ বিমুখতা অত্যন্ত ঘৃণিত। তারা আল্লাহর অভিশপ্ত ও শাস্তির উপযুক্ত।

ইসলাম জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও তা সংরক্ষণে জিহাদকে আবশ্যিক শর্ত হিসেবে ঘোষণা করেছে।

৪. মিথ্যাচার ঃ সব সমাজে সব সময়ই মিথ্যা একটি মারাত্মক ব্যাধি হিসেবে অভিহিত হয়ে আসছে। এটা প্রভূত মন্দ স্বভাব তথা মন্দ কাজের উদ্ভাবক। যে সমাজের মানুষের মধ্যে ব্যাপক মিথ্যার প্রচলন রয়েছে, সে সমাজের মানুষের কোন কিছুরই নিরাপত্তা নিশ্চিত নয়। কেননা মিথ্যা সমাজের মানুষের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, এতে তাদের মধ্যে কোন বিশ্বাসই সৃষ্টি হয় না। এর ফলে মানব সমাজে বিশ্বস্ততা, ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব লোপ পায়। সমাজ তখন এক নিরাপত্তাহীন অবস্থার শিকার হয়। এ সমাজকে মোনাফিকী সমাজ বলে। রসূলুল্লাহ স. বলেন, "মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি : (১) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে। (২) যখন কোন অঙ্গীকার করে তার খেলাফ করে, (৩) কিছু আমানত রাখলে তা খেয়ানত করে।"- আবু দাউদ শরীফ।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন: "আল্লাহ সীমা লংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীদেরকে সত্য পথে পরিচালিত করেন না।"

ইসলাম সত্যবাদিতার উৎসাহ দেয় এবং মিথ্যাবাদীদের পরিণাম সম্পর্কে ভয় দেখায়। মিথ্যা ও অন্যায় পাপের পথ আর পাপ দোজখের দিকে নিয়ে যায়। - বুখারী শরীফ। সমাজের মানুষের নিরাপত্তা মিথ্যাচারের অপরাধ কার্যকর ভাবে উচ্ছেদে নিহিত।

৫. মিথ্যা সাক্ষ্য ঃ ইসলাম মিথ্যা সাক্ষ্যকে মহা পাপ বলে অভিহিত করেছে। রসূলুল্লাহ স. বলেন; 'মিথ্যা সাক্ষ্য আল্লাহর সাথে শরীক করার সমতুল্য। তিনি এটাকে তিন বার বলেন।" আবু দাউদ শরীফ।

মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়। তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। মিথ্যা শপথ দ্বারা অন্যায় ভাবে অপরের মাল আত্মসাৎ বা মিথ্যা সাক্ষ্য দান কবীরা গুনাহ। কোন সমাজে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করণে মিথ্যা সাক্ষ্যকে প্রতিহত করা

আবশ্যিক। ইসলাম একে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছে।
৬। চোগলখুরী করা ঃ চোগলখুরী হলো একের কোন কথা অন্য লোকের কাছে তাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির জন্য বর্ণনা করা বা একজনের এমন কোন গোপন কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করা যাতে সেই লোকটি অপমানবোধ করে। বলতে কি, কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধনের প্রবল ইচ্ছায় যে কথা অন্যের কাছে বর্ণনা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তাই চোগলখুরী। ইসলাম চোগলখুরী কার্যকে নিষিদ্ধ করেছে, কেননা তা মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও বন্ধুত্বকে বিনষ্ট করে, যা কিনা কোন মানব সমাজের ভিতকে ধ্বংস করে দেয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ
দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকদের নিন্দা করে। সূরা হুমাযাঃ ১।
রসূলুল্লাহ্ স. চোগলখুরদের সম্পর্কে বলেন ঃ "চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" কেননা তাদের দ্বারা সমাজে বিশৃংখলা নিরাপত্তাহীন কর্মকান্ড সংঘটিত হয়ে থাকে।
৭. কৃপণতা ঃ ইসলাম কৃপণতাকে কবীরা গুনাহ্ বলে উল্লেখ করেছে। কৃপণ ব্যক্তিরা সমাজের ধন সম্পদ কুক্ষিগত রেখে অন্যের অধিকার আদায় করে না। এতে সমাজের অসহায় মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লংঘিত হয়। কৃপণ ব্যক্তিদের কারণে অতীতে মানব জাতির ধ্বংস সাধিত হয়েছে। কৃপণ ব্যক্তিরা তাদের ধন সম্পদ বিলাসিতা ও ভোগের কাজে খরচ করে।
কৃপণদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন; 'এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তাতে তারা কৃপণতা করে তাদের জন্য সেটা মঙ্গল। তা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। না, তা তাদের জন্য অমঙ্গল। যাতে তারা কৃপণতা করে কিয়ামতের দিন তাই তাদের গলার বেড়ী হবে।" সূরা আলে ইমরানঃ ১৮০।
এদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ স. বলেনঃ "কৃপণ আল্লাহ হতে দূরে, বেহেশত হতে দূরে, এবং জনসমাজ হতে দূরে।" তিরমিযি শরীফ।
রসূলুল্লাহ্ স. আরো বলেন; "দুটি বদ অভ্যাস মুমিনদের মধ্যে থাকতে পারে না; (১) কৃপণতা ও (২) অসদচরিত্রতা।"- তিরমিযি শরীফ।
তোমাদের কেউই পূর্ণ মুমিন হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাই এর জন্য তা পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে থাকে।"- বুখারী শরীফ।
ইসলামী আইনে কৃপণতাকে জঘন্য অপরাধ হিসেবে অভিহিত করে এর বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ পূর্বক জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।
৮. অন্যের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন না করা ঃ একমাত্র ইসলামী জীবন বিধান সমাজের অন্যের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনকে রক্ষণাবেক্ষন করে- মানুষের মর্যাদা তথা সম্মানের বিধান করেছে। এদ্বারা সমাজের মানুষের সম্মানের নিরাপত্তা সাধিত হয়। মানুষের একে অন্যের প্রতি সম্মান দেখানো এবং তাদের পরস্পর মর্যাদাবোধ

এমন সব আবশ্যকীয় বস্তুর অন্তর্গত যা দ্বারা সমাজে সম্প্রীতি ও ভালবাসা জন্মে। অন্যদিকে অন্যের প্রতি অনাস্থা ও সম্মানহানিকর হিংসা-বিদ্বেষ, বিচ্ছিন্নতা ও কার্যাবলী পরস্পরের মাঝে অসহযোগিতা সৃষ্টি করে। এ কারণে একজন মুমিন ব্যক্তি অন্যের প্রতি বিরূপ আচরণ করা, কাউকে তিরস্কার করা, মন্দ উপাধিতে ডাকা, কারো সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করা, অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করা, পরনিন্দা করা সর্বদা পরিহার করে চলবে। এদ্বারা সমাজ জীবনে পরস্পরের মান-মর্যাদা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পবিত্র কুরআনের সূরা হুজরাতের ১০-১২ আয়াতে আল্লাহ তাআলা, মুমিন গণ পরস্পর ভাই ভাই আখ্যায়িত করে তাদের উপহাস, একে অপরের প্রতি দোষারোপ, মন্দ নামে ডাকা, পশ্চাতে নিন্দা, অহেতুক কল্পনা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ঙ) সামাজিক জীবনে পরস্পর লেনদেনের ক্ষেত্রে পাপ বা অপরাধ ঃ

রাষ্ট্রীয় সমাজে বসবাসকারী মানুষের জননিরাপত্তা কার্যকরী ভাবে সংরক্ষণের জন্য যে সব কাজ দ্বারা সমাজের কারো কষ্ট হয়, দুঃখ হয়, বেদনা সৃষ্টি করে, সে সব কাজ পরিহার করে প্রত্যেককে তার ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে দেয়ার দ্বারাই পারস্পরিক লেনদেন স্থির হয়। আর এর মাধ্যমেই মূলত মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়ে থাকে।

সামাজিক জীবনে এহেন পরস্পর লেনদেনের ক্ষেত্রে যে সব পাপ বা অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে, তা থেকে জনগণকে বিরত রাখার মধ্যে জননিরাপত্তা বিষয়টি নিহিত। ইসলাম পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় প্রত্যয়ী বিধায় এ পথে যে সব আচরণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা রোধের কঠোর নির্দেশনা দিয়েছে। যা দ্বারা সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব, যা পৃথিবীর অন্য কোন ব্যবস্থায় নেই। পারস্পরিক লেনদেনে যে সব পাপ বা অপরাধ সংঘটিত হতে পারে তা হলো;

১। ধোঁকা দেয়া

২। অন্যায় ভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা

৩। ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা

৪। উৎকোচ গ্রহণ

৫। সুদ খাওয়া

৬। মূল্য বৃদ্ধির মানসে জরুরী পণ্য সামগ্রী গুদামজাত করণ।

৭। মিথ্যা শপথ

১. ধোঁকা ঃ সামাজিক জীবনে একে অপরকে ধোঁকা দেয়া মারাত্মক অপরাধ। অতএব প্রত্যেকে বিশ্বস্ততার সাথে লোকদের সাথে আদান-প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে কোনরূপ ধোঁকা দিলে বিশ্বস্ততা লোপ পায় এবং তদস্থলে সন্দেহ, হিংসা স্থান দখল করে। এ অবস্থা সমাজের মানুষের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলে।

"এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই, আর কোন মুসলমানের জন্যই তার অন্য ভাইয়ের কাছে কোন দোষযুক্ত বস্তু বিক্রি করা পাপ, দোষ সম্পর্কে অবহিত না করে তা বিক্রি করা অবৈধ।"
"তোমাদের কেউই পূর্ণ মুমিন হবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।"- নাসাঈ।
উপরোক্ত হাদিস থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম সমাজের কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে কখনই ধোঁকা দিবে না। তাই তারা পরস্পর পরস্পরের কাছে নিরাপদ।
২. অন্যায় ভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা ঃ ইসলামী আইনে অন্যের মাল অন্যায় ভাবে আত্মসাৎ করা অপরাধ। আল্লাহ্ বলেন; "হে বিশ্বাসীগণ তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায় ভাবে গ্রাস করো না। কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাজী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ। নিজেদেরকে হত্যা করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। এবং যে কেউ অন্যায়ভাবে সীমা লংঘন করে তা তাকে অগ্নিতে দগ্ধ করবে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ সাধ্য"। -সূরা নিসা: ২৯-৩০।
রসূলুল্লাহ স. বলেন: যে ব্যক্তি বিনা অধিকারে অন্যের জমির কিয়দংশ আত্মসাৎ করবে কিয়ামতের দিন তাকে সপ্ত জমির বেড়ি তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে।- বুখারী শরীফ।
ইসলামী আইন এ বিধান দ্বারা জনগণের একটি মৌলিক অধিকারের বিষয় সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করেছে।
৩. ইয়াতিমের মাল আত্মসাৎ করা ঃ ইসলামী আইন ইয়াতিমের মালের নিরাপত্তা বিধানের কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। ইয়াতিমের মাল আত্মসাৎ করা অপরাধ। আল্লাহ্ বলেন: যারা পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায় ভাবে গ্রাস করে তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে। এ অপরাধ এই পৃথিবীতে যেমন শাস্তিযোগ্য, তেমনি পরকালে দোজখের আগুনেও জ্বলতে হবে।
ইসলামী আইন ইয়াতীম প্রতিপালনকে মহা সওয়াবের কাজ বলে ঘোষণা করেছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ "তারা যেন ভয় করে যে, অসহায় সন্তান পেছনে ছেড়ে গেলে তাদের সম্বন্ধে তারা উদ্বিগ্ন হতো। সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সংযত কথা বলে।" সূরা নিসা: ৯।
এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ স. বলেছেন: "আমি এবং ইয়াতীমের প্রতিপালনকারী ব্যক্তি বেহেশতে এরূপ অর্থাৎ পাশাপশি অবস্থান করবো।"
৪. উৎকোচ গ্রহণ ঃ ইসলামী আইনে উৎকোচ বা ঘুষ সম্পূর্ণ হারাম। ঘুষ মানুষের সামাজিক নিরাপত্তাকে দারুন ভাবে বিঘ্নিত করে এবং বিভিন্ন অপরাধ মূলক কর্মকান্ড সম্পাদনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করে।
আল্লাহ্ বলেন: "তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ সম্পদ অন্যায় ভাবে গ্রাস

করো না এবং মানুষের সম্পত্তি কিয়দংশ জেনে শুনে অন্যায় ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণকে ঘুষ দিও না।- সূরা বাকারাঃ ১৮৮।

ইসলামী আইনে ঘুষ গ্রহণ ও ঘুষ প্রদান উভয়ই সমান অপরাধ। রসূলুল্লাহ স. উৎকোচ দাতা-গ্রহীতা উভয়কেই অভিসম্পাত করেছেন। - তিরমিযী ও আবু দাউদ।

"রসূলুল্লাহ স. বিচারের ব্যাপারে উৎকোচ দাতা-গ্রহীতা উভয়কেই লানত করেছেন তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ।

রসূলুল্লাহ স. বলেন, যাকে আমরা কোন কাজে নিযুক্ত করবো, তাকে আমরা পারিশ্রমিক দেব। এর পর যে যা নেবে তা হবে ধোকা।" আবু দাউদ।

ইসলামী আইন উৎকোচ গ্রহণও প্রদানকে মহাপাপ হিসেবে নিষিদ্ধ করে সমাজের মানুষের নিরাপত্তা বিধান করেছে।

৫. সুদ খাওয়া ঃ মানুষের পাওনা ন্যায্য ভাবে পাবার নিরাপত্তা বিধান করেছে ইসলাম। সামাজিক জীবনে জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ধ্বংস করে। তাই সুদ একটি জঘন্য অপরাধ। ইসলামী আইন সুদকে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষনা করেছে। আল্লাহ বলেনঃ "হে বিশ্বাসীগণ। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। যদি তোমরা না ছাড় তবে জেনে রাখ যে, এটা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধ, কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবে না অথবা অত্যাচারিত হবে না"। সূরা বাকারা-১৭৮,১৭৯।

রসূলুল্লাহ স. বলেন- "যে সুদ খায়, যে সুদ দেয় আর যারা সাক্ষী হয় এবং যারা দলিলপত্র লেখে তাদেরকে রসূলুল্লাহ স. লানত করেছেন"। বুখারী শরীফ।

৬. মূল্য বৃদ্ধির মানসে জরুরী পণ্যসামগ্রী গুদামজাত করণ ঃ

সমাজ জীবনে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সামগ্রী মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গুদামজাতকরণ একটি অনৈতিক, জনস্বার্থ পরিপন্থী কাজ। এতে উক্ত পণ্য জনগনের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। এজন্য ইসলাম একে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করে তাযিরের আওতায় শাস্তির বিধান করেছে। আল্লাহর রসূলুল্লাহ স. বলেন; "যে ব্যক্তি মুসলমানদের খাদ্য আটকিয়ে রাখে আল্লাহ তাকে অভাব অনটন ও জুযাম (কুষ্ঠ) ব্যাধি দ্বারা শাস্তি দেবেন"।- ইমাম আহমদ।

"যে ব্যক্তি মূল্য বৃদ্ধি কল্পে খাদ্য বস্তু জমা রাখে সে পাপী"।- মুসলিম ও আবু দাউদ। যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন খাদ্য দ্রব্য আটকিয়ে রাখে সে আল্লাহ হতে সম্পর্কহীন। আল্লাহ ও তার সাথে সম্পর্ক রাখেন না।"- ইমাম আহমদ।

"যে ব্যক্তি লোকের প্রতি রহম করে না তার প্রতি আল্লাহ্ দয়া দেখান না"।

- বুখারী শরীফ।

ইসলামী আইন অবৈধ ভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য-সামগ্রী গুদামজাত করণকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তা রোধের মাধ্যমে রাষ্ট্রের জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করেছে।

৭. মিথ্যা শপথ ঃ মিথ্যা শপথ জননিরাপত্তার অন্তরায়। কেননা এটি সমাজের মানুষের অন্যের সম্পদ আত্মসাতের একটা পন্থা বা উপায়। রসূলুল্লাহ্ স. এ সম্পর্কে সর্তক করে বলেছেন, এতে উপার্জনের বরকত বিলুপ্ত হয়ে যায় আর মিথ্যা শপথ কারী আল্লাহর অভিসম্পাতের উপযুক্ত হয়। তিনি বলেন: "শপথ দ্বারা মালের কাটতি বাড়ে, কিন্তু উপার্জনের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে।" বুখারী শরীফ।

রসূলুল্লাহ্ স. আরো বলেন: যে ব্যক্তি অন্যের মাল আত্মসাতের জন্য মিথ্যা শপথের আশ্রয় গ্রহণ করবে, সে যখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন আল্লাহ্ তাআলা তার উপর রাগান্বিত থাকবেন।"- বুখারী শরীফ।

এই মিথ্যা শপথের মাধ্যমে সমাজের সরল প্রাণ লোকদের ধোঁকা দেয়া হয়, এতে তাদের সম্পদের ও অন্যান্য বিষয়ের নিরাপত্তা দারুন ভাবে বিঘ্নিত হয়। সমাজ জীবনে নেমে আসে অশান্তি। একারণে ইসলামী আইন মিথ্যা শপথের অপরাধে তাযিরের শাস্তির বিধান করে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

চ) আত্মম্ভরিতা ঃ

ইসলামী আইন তথা শরীয়ত জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে তার সার্বিক দিক ও বিভাগ বিবেচনা করেই যথা প্রযোজ্য বিধান প্রবর্তন করেছে। রাষ্ট্রীয় সমাজে জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার একটি উপাদান আত্মম্ভরিতা। আত্মম্ভরিতা একটি মারাত্মক পাপ বা অপরাধ। এ অপরাধের বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থান কঠোর। সহজ অর্থে আত্মম্ভরিতা হলো আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের উপর গর্বভরে উচ্ছৃংখল হওয়া। তার শোকর আদায় না করে সীমালংঘন করা।

আল্লাহ্ তাআলা আত্মম্ভরিতার ব্যাপারে ভয় দেখিয়ে তার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে মানুষ জাতিকে সতর্ক করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন: "কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ সম্পদের জন্য মদমত্ত ছিল। এগুলো তাদের ঘরবাড়ী। তাদের পর এগুলোতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে। আমি চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।"- সূরা কাসাস ৫৮। আত্মম্ভরিতার পাপ যে সব আচরণ থেকে হতে পারে, তা হলো;

১। নিয়ামতের নাশোকরী

২। ধনমত্ততা

৩। অপব্যয় ও অপচয়

৪। অহংকার

৫। ফাসাদ বা বিপর্যয় সৃষ্টি করা।

১. নিয়ামতের নাশোকরী ঃ নিয়ামতের নাশোকরী একটি অপরাধ। যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের শোকর আদায় করে না বরং আল্লাহর দানকে অস্বীকার করে সে নাশোকরকারী বান্দা। আর যে ব্যক্তি নিজের উপর আল্লাহর নিয়ামতের বাহুল্য খরচ করে ব্যক্তিগত সুখ লুটতে থাকে, তা হতে পড়শী, দেশবাসীকে বঞ্চিত করে সেও নিয়ামতের না-শোকর বান্দা। আর যে ব্যক্তি অতি মুনাফার আশায় খাদ্যদ্রব্য জমা করে অন্যদেরকে বঞ্চিত করে সেও না-শোকর বান্দা। আর যে ব্যক্তি কোন ফাসাদ সৃষ্টি করে বা ফাসাদ দমনে অগ্রসর হয় না, সেও না- শোকর বান্দা। এই না-শোকর বান্দাগণ অন্যান্য মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে, বিনষ্ট করে। আল্লাহ বলেন:'আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন একজনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিত, সেথায় আসতো সব দিক থেকে প্রচুর জীবন উপকরণ, অত:পর তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করলো; ফলে তারা যা করতো তজ্জন্য আল্লাহ তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির।" সূরা নহল: ১১২।

উপরোক্ত আয়াত হতে একথা বললে কোনই অত্যুক্তি হবে না যে, বর্তমান ধনী দেশগুলোর অর্থনৈতিক মন্দা আল্লাহর নিয়ামতের নাশোকরীর ফল। ইসলাম জননিরাপত্তার জন্য আল্লাহর নিয়ামতের শোকরগুজারী করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ বলেন: "তোমরা এমন ফিতনাকে ভয় কর যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা জালিম কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহর শাস্তি দারুন কঠোর।" সূরা আনফাল: ২৫।

আল্লাহর দেয়া সম্পদের শোকরিয়া আদায় না করলে, তদ্বারা সমাজের মানুষের জীবনে চরম নিরাপত্তাহীন অবস্থার সৃষ্টি হয়।

২. ধনমত্ততা ঃ ধনৈশ্বর্য মত্ততায় মানুষকে প্রলুব্ধ করে যার ফলে ঐ ব্যক্তির উপর কুফল ফলতে আরম্ভ করে। এ অবস্থায় সমাজের লোকদের ধন সম্পদ গুটি কতক লোকের হাতে একত্রিত হওয়ায় সমাজের অন্যান্যরা উক্ত ধন সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে সমাজে শ্রেণী বৈষম্য বা শ্রেণী সংগ্রাম সৃষ্টি হয় যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে গৃহযুদ্ধ বেধে যায়। একারনে ইসলাম ধনমত্ততাকে অপরাধ বলে অভিহিত করেছে। ধনমত্ততায় মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা দারুন ভাবে বিঘ্নিত হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন: "আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই তখন এর

সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে সৎকর্ম করতে আদেশ করি কিন্তু ওরা সেখানে অসৎকর্ম করে। অতঃপর তাদের প্রতি ধ্বংসের নির্দেশ ন্যায় সঙ্গত হয়ে যায় এবং আমি তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করি।"- সূরা বনী ইসরাঈলঃ ১৬।

সমাজের ধনী লোকেরা তাদের ধনাঢ্যতা দ্বারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। অতঃপর তারা এমন সব আইন প্রণয়ন করে যাতে তাদের ধন সম্পদ চিরস্থায়ী হতে পারে। এজন্যই তারা সমাজের কোন কল্যাণমূলক সংস্কারের আহবানকে বিরোধিতা করে। কেননা এতে তাদের সম্পদহানির আশংকা থাকে। কিন্তু ইসলামী আইনে এর কোন অবকাশ নেই। ইসলামী আইনে ধনমত্ততার প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার সংকট সৃষ্টি হয় না; যেমনটি পুঁজিবাদী সমাজে হয়ে থাকে।

৩. অপব্যয় ও অপচয় ঃ সম্পদের অপব্যয় ও অপচয় সম্পদের সংকট সৃষ্টি করে। এতে সমাজের মানুষের দুর্ভোগ ও কষ্ট বৃদ্ধি পায়। এটা জননিরাপত্তার প্রতিকূল। এজন্য আল্লাহ বলেনঃ "আহার করবে ও পান করবে কিন্তু অমিতাচার করবে না। আল্লাহ অমিতাচারী কে পছন্দ করে না।" সূরা আরাফ ৩১।

"যারা অপব্যয় করবে তারা শয়তানের ভাই। এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।- সূরা বনী ইসরাঈল-২৭

"তোমাদের যে সম্পদে আল্লাহ তোমাদের উপজীবিকা করেছেন তা বিরোধীদের হাতে অর্পণ করোনা।"- সূরা নিসাঃ ৫।

আল্লাহর রসূলুল্লাহ স. বলেনঃ "আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি বস্তু পছন্দ করেন না। (১) অনর্থক ও বাজে কথা বলা; (২) নিস্প্রয়োজনে সময় নষ্ট করা; (৩) অত্যধিক প্রশ্ন করা।"- বুখারী শরীফ।

যে সমাজে ধনীরা সম্পদের অপব্যয় ও অপচয় করে, সে সমাজের গরীবেরা অর্থনৈতিক দুর্ভোগের শিকার হয়। এ কারণে ইসলামী আইনে এটি নিষিদ্ধ। ইসলামী আইন একে নিষিদ্ধ করে জননিরাপত্তাকে সুদৃঢ় করতে প্রয়াস পেয়েছে, এমনটি মানব রচিত কোন আইনে নেই।

৪. অহংকার ঃ অহংকার কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। অহংকার মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় এবং ধ্বংসকে অনিবার্য করে তোলে। এজন্যই ইসলাম অহংকারকে অপরাধ হিসেবে ঘোষনা করেছে। আল্লাহ বলেনঃ "যারা অহংকার করে তিনি তাদেরকে ভালবাসেন না।"- সূরা নাহলঃ ২৩

"পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে গর্ব করে বেড়ায় তাদের দৃষ্টি আমার নির্দশন হতে ফিরিয়ে দেবো।"- সূরা আরাফঃ ১৪৬।

"পৃথিবীতে উদ্ধত ভাবে বিচরণ করো না। কারণ আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে ভালবাসেন না।" সূরা লুকমানঃ ১৮

অহংকারের বাহ্যিক নির্দশন অনেক। তন্মধ্যে নিজেকে বড় মনে করা, অন্যকে নিচ মনে করা, সত্যকে প্রত্যাখান করা, সত্যের অনুগামী না হওয়া।

সমাজের সংযত অবস্থানপূর্বক জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অহংকার বড় অন্তরায়। একারণে ইসলাম অহংকারকে বড় অপরাধের পর্যায়ভুক্ত করে জনগনকে তা পরিহার করতে উপদেশ ও শিক্ষা দিয়েছে। যাতে সমাজের মানুষের নিরাপত্তার কোনরূপ অন্ত রায় সৃষ্টি করতে না পারে।

৫. ফাসাদ বা বিপর্যয় সৃষ্টি করা ঃ সমাজের মানুষের নিরাপত্তার আর একটি বড় অন্ত রায় ফাসাদ। ফাসাদ সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ফাসাদ ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ইসলাম কঠোর শাস্তির বিধান করেছে। আল্লাহ পৃথিবীতে ফাসাদকারীদের কঠোর শাস্তি দিয়েছেন। আল্লাহ বলেনঃ "এবং তথায় তারা অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল। অতঃপর তোমার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানলেন।"- সূরা ফজরঃ ১২-১৩।

"আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভ্রাতা শোয়াইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, শেষ দিবসকে ভয় কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইও না। কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যারোপ করলো। অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হলো। এতে তারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল।"- সূরা আনকাবুতঃ ৩৬-৩৭

২. রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের বাহ্যিক অপরাধ নির্মূলের ব্যবস্থা ঃ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা শরীয়ত মানুষের জীবনে অপরিহার্য বিষয়াবলী যা কিনা মানুষের সত্তার সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে সম্পৃক্ত তার যথাযথ নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে তা সংরক্ষণে দৃঢ় প্রত্যয়ী এবং সে লক্ষ্যে যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনের বিধান প্রবর্তন করেছে। এ বিধান ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে কার্যকরী করার মধ্যেই সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিহিত। মানুষের জীবনের অপরিহার্য মৌল স্বার্থ এবং অস্তিত্ব ও সুষ্ঠু বিকাশধারা যেগুলোর নির্ভরশীল সেগুলো হলো ঃ

১. মানুষের জীবন ও মন

২. পবিত্র জন্মধারা ও বংশ ক্রম

৩. সম্পদ

৪. সম্মান

৫. ধর্ম ও বিশ্বাস

সমাজের কোন মানুষ যাতে এসব ক্ষেত্রে কোন রকম অবৈধ হস্তক্ষেপপূর্বক জননিরাপত্তাকে হুমকীর সম্মুখীন করতে না পারে; তজ্জন্য ইসলামী আইন তথা শরীয়ত ঐ সব অবৈধ হস্তক্ষেপ বা সীমালংঘনকে মহাপাপ বা মারাত্মক অপরাধ হিসেবে

চিন্‌হিত করে তার প্রতিকার স্বরূপ প্রকৃত ও যথাযথ শাস্তি বিধান প্রবর্তন করেছে। প্রতিটি রাষ্ট্রের আবশ্যিক দায়িত্ব ঐ সব ক্ষেত্রে সংঘটিত অপরাধের শাস্তি স্বরূপ ইসলামে বর্ণিত দন্ডের বিধান কার্যকরী করা। যাতে সমাজের কোন মানুষের পক্ষে মানুষের ঐ সব ক্ষেত্রে কোন রকম হস্তক্ষেপ করার সাহস না থাকে। ইসলাম মানুষের বাহ্য অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলে তিন প্রকার দন্ডের বিধান করেছে:

১. হদ্দ (Hadd)

২. কিসাস (Qisas)

৩. তাযির (Tazir)

১. হদ্দঃ হদ্দ হলো নির্ধারিত শাস্তি। আল্লাহ পাক এ শাস্তি পবিত্র কুরআনে নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তা কার্যকর করা বাধ্যতামূলক। "হদ্দ" শব্দের অর্থ বাধা দান বা প্রতিরোধ। এর দ্বারা অপরাধীকে মানুষের অপরিহার্য মৌল ক্ষেত্রে অবৈধ হস্তক্ষেপ পূর্বক অপরাধ সংঘটনে বাধা দান করে। হদ্দকে আল্লাহর অধিকার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ শব্দের অর্থ এর আওতাভুক্ত শাস্তির প্রকৃতি ও পরিধি সত্যিই সমাজের মানুষের মনকে অপরাধ মুক্ত করতে বা অপরাধের দিকে ঝুকে না পড়তে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে কাজ করে। যে সব অপরাধ হদ্দ এর শাস্তির আওতায় পড়ে তা হলো ঃ

১. চুরি (Theft)

২. জেনা বা ব্যভিচার

৩. অপবাদ (কজফ)

৪. ডাকাতি (হিরাবা)

৫. মদ্যপান (শারাব)

৬. রাষ্ট্রদ্রোহিতা

৭. ইসলাম ধর্মত্যাগ (রিদ্দাহ্)

১. চুরি ঃ চুরির শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: "পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হাত কেটে দাও। এটাই তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর নির্ধারিত আদর্শ দন্ড, আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।- সূরা মায়েদা: ৩৮

চুরি কি? চুরি হলো কোন নিসাব পরিমাণ অস্থাবর সম্পত্তি মালিকের সম্মতি ব্যতীত অসাধু ভাবে নিজের দখলে নেয়ার অভিপ্রায়ে উক্ত সম্পত্তি স্থানান্তর করা। এখানে নিসাব পরিমাণ অর্থ দশ দিরহাম (বর্তমানে প্রায় পাচ হাজার টাকার সমান)।

চুরির শাস্তি কি? চুরির অপরাধ প্রমাণিত হলে প্রথমতঃ অপরাধীর ডান হাতের কব্জি থেকে কেটে দিতে হবে।

চুরির শর্তাবলী ঃ কোন কাজের মধ্যে নিম্নোক্ত শর্তাবলী বিদ্যমান হলে তবেই তাকে চুরি বলা যাবে-

১. গোপনে করা;

২. হস্তগত বস্তুর মূল্যমান থাকা;

৩. তা অপরের দখলভুক্ত থাকা;

৪. তা নিরাপদ সংরক্ষিত স্থান হতে হস্তগত করা;

৫. তা চোর কর্তৃক পুরোপুরি নিজ দখলে নেয়া;

৬. তার মূল্য নিসাব পরিমাণ হওয়া

৭. তা স্থানান্তর যোগ্য হওয়া

৮. অসৎ উদ্দেশ্যে হস্তগত করা

চুরির প্রমাণ ঃ তিনটি উপায়ে চুরি প্রমাণিত হবে;

ক. সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা,

খ. অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি দ্বারা; এবং

গ. বাদীর শপথ দ্বারা।

সাধারণত ধারণা করা হয় যে, মানুষ চুরি করে দারিদ্র্যের কারণে, ক্ষুধা নিবৃত্তির ব্যবস্থা নেই বলে। কিন্তু ইসলাম তো এ বিষয়ে পূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিকই তার জীবিকা পাবে, তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হবে। কোন লোকই না খেয়ে থাকতে বা অভাব অনটনে ছটফট করতে বাধ্য হবে না। আর এ কারণেই ইসলামী রাষ্ট্রে, যেখানে ইসলামী শরীয়ত কার্যকর, কারুরই চুরি করার কোন আবশ্যকতা থাকতে পারে না। এরূপ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও চুরির কাজে অগ্রসর হতে পারে কেবল মাত্র সেই সব লোক যারা ধন সম্পদের লোভী, যারা অধিক সম্পদ করায়ত্ব করার অভিলাসী, কিংবা যারা অন্যায় অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা অথবা পাপ পথে বেহিসেব অর্থ ব্যয় করার সুযোগের জন্য লালায়িত। অতএব তা সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে খুবই ক্ষতিকর ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। এ কারনে ইসলামে চুরি সমর্থনীয় নয়। ইসলামী সমাজে চুরির কোন সুযোগ থাকতে পারে না। তাই জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরার জন্যই চুরির পথ ও কারণ সর্বাত্মক ভাবে বন্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যিক। হাত কাটার শাস্তির মাধ্যমেই তা অর্জন সম্ভব। মহান আল্লাহ তার আনুগত্যের জন্য মানব জাতির সর্বাত্মক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিধান কল্পে চোরের শাস্তি হাত কাটার বিধান করেছেন। অথচ আজকাল মুশরিক ও কুফরী মতাদর্শীরা একে বর্বরতার শাস্তি বলে বিদ্রুপ করতে কুণ্ঠিত হয় না। তাদের চোরের প্রতি খুবই ব্যথা ও দরদ। বলতে কি যারাই আল্লাহর এ বিধানকে বর্বর বলে তারাই বর্বর। যে সব অপরাধী সমাজের সাধারণ মানুষের ধন-মাল চুরি করে নিয়ে যায় সে সব অপরাধীর প্রতি তাদের দয়া সহানুভূতির বন্যা বয়ে যায়; আর নিরীহ শান্তিপ্রিয় জনগণের জীবনে

কঠিন সমস্যা সর্বস্বহীনতা, নারী ও শিশুদের অতি চিৎকারের প্রতি তাদের মনে একবিন্দুও দয়ার উদ্রেক হয় না।

চুরির বিচারে কিছু সংখ্যক চোরের হাত কাটা হলে গোটা সমাজই সম্পূর্ণরূপে বিপদ মুক্ত হয় এবং জনগনের ধন-মাল সম্পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। মানুষ নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে।

খেলাফতে রাশেদার শাসন আমল পর্যন্ত মাত্র দুই বা তিনটি হস্ত কর্তনের শাস্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। অথচ বর্তমান প্রগতিশীল আধুনিক সমাজে যেখানে আল্লাহর বিধানকে নিষ্ঠুরতা বলা হয়, যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার চুরির ঘটনা ঘটছে। এ থেকে প্রতীয়মান একমাত্র ইসলামী আইনেই জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।

২. যেনা বা ব্যভিচার

আল্লাহ্ বলেনঃ "তোমরা যেনার নিকটবর্তীও হবে না, তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ"- সূরা বনী ইসরাঈলঃ ৩২

"যেনা কারিণী ও যেনাকারী তাদের প্রত্যেকে একশত কশাঘাত করবে। আল্লাহর বিধান কার্যকরী করতে গিয়ে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান এনে থাকো। মুমিনগণের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" সূরা নূর : ২

যেনা কি?

ইসলাম স্বীকৃত অধিকার ব্যতীত নারী ও পুরুষের মধ্যে যৌন মিলনকে যেনা বলে। যেনার দু'টি অংশ;

এক. অবিবাহিত মুসলিম নর-নারীর মধ্যে বৈধ অধিকার ব্যতীত যৌন মিলন।

দুই. বিবাহিত মুসলিম নর-নারীর মধ্যে বৈধ অধিকার ছাড়া যৌন মিলন।

যেনার শাস্তি

ক। অবিবাহিত মুসলিম নর-নারীর মধ্যে যৌন মিলনের ক্ষেত্রে একশত দোররা।

খ। বিবাহিত মুসলিম নর-নারীর মধ্যে যৌন মিলন সংঘটিত হলে সেক্ষেত্রে প্রত্যেককে পাথর নিক্ষেপে হত্যা।

হদ্দযোগ্য যেনার শাস্তির শর্তাবলী ঃ নিম্ন লিখিত শর্তাবলী বিদ্যমান থাকলে দুইজন নারী-পুরুষের যৌনকর্ম হদ্দযোগ্য যেনা হিসেবে গণ্য হবে-

১. যেনা কর্মে লিপ্ত নারী-পুরুষ পরস্পর স্বামী-স্ত্রী নয়;

২. উভয়ে বালেগ

৩. উভয়ে মুসলিম

৪. উভয়ে বোধ শক্তি সম্পন্ন

৫. উভয়ে জীবিত

৬. যৌন কর্ম স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে অনুষ্ঠিত হয়েছে

৭. দু'জনের একজন পুরুষ এবং অপর জন নারী

৮. পুরুষাঙ্গ জননেন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট করানো হয়েছে

যেনার প্রমাণ ঃ

১. চারজন সাবালক ও বুদ্ধিমান পুরুষ স্বচোখে অপরাধীদ্বয়কে উক্ত কাজে লিপ্ত দেখার সাক্ষ্য দান;

২. উভয় বা যে কোন একজন স্বেচ্ছায় বার বার যেনার স্বীকারোক্তি দান;

৩. কোন কুমারী বা স্বামীহীন নারী গর্ভবতী হলে এবং সে অবৈধ গর্ভের স্বীকারোক্তি করলে।

আল্লাহ্ পাকের যেনার এরূপ শাস্তির বিধান করার পেছনে মানব জাতির মহা কল্যাণ ও সংহতি নিহিত। মানব জাতির পবিত্র ও বিশুদ্ধ জন্ম এবং সংগতি পূর্ণ বংশ ধারা সমুন্নত রেখে মানুষের মর্যাদার নিরাপত্তা বিধান করেছেন।

বিবাহিত নারী বা পুরুষের মান মর্যাদা আত্ম সচেতনতাবোধ এবং তা লংঘনে বীভৎসতা সম্পর্কে অবহিত এবং স্বামী-স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি নির্দিষ্ট করে তাদের সম্পর্ক সংরক্ষণের জন্য এবং অধিকতর দায়িত্বশীলতা ও ক্ষতিগ্রস্থ হবার খারাপ পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করার জন্যই এরূপ শাস্তির বিধান করেছে।

ব্যভিচার মুক্ত পরিবারই পারে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ উপহার দিতে। যে সমাজে ব্যভিচারের সুযোগ বেশী সে সমাজ কখনো সুস্থ ও সুন্দর হতে পারে না।

বর্তমান বিশ্বে এইডস এর নামে যে ব্যাধি বিস্তার লাভ করে মানব প্রজন্মকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে, তার মূলে অবাধ যেনার পরিবেশ। একমাত্র ইসলামী অনুশাসনই পারে বিশ্ববাসীকে তা থেকে পরিত্রান দিতে।

যে অবস্থা, পরিস্থিতি ও পরিবেশ মানুষকে যেনার ন্যায় অপরাধে লিপ্ত হতে প্রলুব্ধ করে ইসলামী আইন বিভিন্ন পন্থায় তা সংশোধনের পদক্ষেপ নেয়। ব্যভিচারের শাস্তি প্রসঙ্গে বলা যায় যে, সামাজিক সংস্কার ও মানুষের নৈতিক অবস্থার উন্নয়নের পূর্বে রসূলুল্লাহ স. কখনো এ অপরাধের শাস্তি কার্যকর করেননি। ব্যভিচারে প্ররোচিত করার যেসব উপাদান রয়েছে, ইসলাম তা সংশোধনের প্রয়াস পায়। যেমন- নারী, পুরুষের দৃষ্টি সংযত রাখা, লজ্জাস্থানের হেফাজত, বিবাহের ব্যবস্থা করা, পর্দার ব্যবস্থা, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিয়ন্ত্রণ, যৌন সুরসুরি সৃষ্টিকারী সকল উপাদান নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি । যেনার শাস্তি বিবাহিত হলে পাথর নিক্ষেপপূর্বক, আর অবিবাহিত হলে বেত্রদন্ড। এটিও যুক্তিসঙ্গত সুবিচারপূর্ণ।

৩. অপবাদ

অপবাদ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন: "যারা স্বাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশি কষাঘাত করবে এবং তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করবে না। এরাই তো সত্যত্যাগী।"- সূরা নূর :৪।

অপবাদ কি? যদি কোন ব্যক্তি মুসলিম পুরুষ অথবা নারীর উপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তাকে অপবাদ বলে। এর শর্ত হলো:

ক. এ অপবাদ হতে হবে সৎ চরিত্রবান পুরুষ বা নারীর উপর।

খ. অপবাদকারীকে পূর্ণ বয়স্ক ও সুস্থ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে।

গ. অপবাদ দিতে হবে স্বেচ্ছায়।

অপবাদের শাস্তিঃ আশি কষাঘাত

যেনার মিথ্যা অভিযোগকে ইসলামী আইনে মারাত্মক অপরাধ হিসেবে গণ্য করার মূল উদ্দেশ্য মানুষের মান সম্মানের সুষ্ঠু ও কার্যকর নিরাপত্তা বিধান। কেননা অপরাধের পরিণতি খুবই ভয়াবহ। এতে সমাজে নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও চরিত্রহীনতা ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের আস্থা থেকে চিরদিনের জন্য সমাজ বঞ্চিত হয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে সমাজে ব্যাপক প্রচারণা চলতে থাকে তা প্রমাণ করে এবং তার খারাপ পরিণতি রোধ করা বা তার কুপ্রভাব মুছে ফেলার জন্যই এহেন চরম শাস্তির বিধান। এ সমাজকে যেমন পবিত্র করে, তেমনি সত্যকে করে সুপ্রতিষ্ঠিত।

৪. ডাকাতি

ডাকাতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ হতে নির্বাসন দেয়া হবে। দুনিয়ার এটাই তাদের পাওনা ও পরকালে তাদের জন্য মহা শাস্তি রয়েছে।"- সূরা মায়েদা : ৩৩

ডাকাতি কি? এক ব্যক্তির বা একাধিক দলবদ্ধ ব্যক্তির শক্তির প্রতিবাদ করা যায় না। এই সংঘবদ্ধ দলে বন্দুক, বোমা, দা, চাকু, লোহার রড, লাঠি, পাথর সহ অন্য যে কোন অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কোন মালিকের ইচ্ছার উপর শক্তি প্রয়োগ পূর্বক সম্পদ ছিনিয়ে নেয়াকে ডাকাতী বলে। লুণ্ঠনকৃত মালের মূল্য দশ দিরহামের কম হবে না। ডাকাতি হতে পারে সশস্ত্র, বড় চুরি অথবা রাজপথে।

ডাকাতির শাস্তি ঃ ডাকাতির সময় যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা, জখম, ভয়-ভীতি, আটক ইত্যাদি না করে তাহলে ডাকাত দলের প্রত্যেক সদস্যের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করা হবে। চুরির থেকে ডাকাতির অপরাধ মাত্রার দিক থেকে মারাত্মক। ইসলামী আইন এ অপরাধকে স্থায়ী ভাবে উৎপাটনের জন্য এরূপ বিধান করেছে যা দ্বারা সমাজের মানুষের জীবন ও সম্পদের যথাযথ নিরাপত্তা বিধান সম্ভব।

৫. মদ্যপান

মদ্যপান সম্পর্কে আল কুরআনে আল্লাহ্‌ বলেন: "হে ঈমানদার লোকেরা! মদ, জুয়া, বলিদানের স্থান ও পাশা এসবই জঘন্য শয়তানী কাজ। এগুলো পরিহার করো। আশা করা হচ্ছে, তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে। শয়তান তো এই মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে সংকল্পবদ্ধ। তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও সালাত থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট। তাহলে কি তোমরা এ সব থেকে বিরত থাকবে না?" সূরা মায়েদা: ৯০/৯১

এ প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ্‌ স. বলেছেন: "সকল প্রকার নেশার জিনিসই মাদক এবং সকল নেশার জিনিসই হারাম। যার সামান্য পরিমাণও মানুষকে নেশাগ্রস্থ করে। তার পূর্ণ অঞ্জলী পরিমাণও হারাম" হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত।

মদ্য পান কি? কোন সাবালক সুস্থ্ জ্ঞান সম্পন্ন, যে কথা বলতে পারে এমন লোক যদি ইচ্ছা করে জ্ঞাতসারে এক ঢোক মদও পান করে সে এজন্য শাস্তিযোগ্য অপরাধী হবে।

শাস্তি ঃ মদপানের অপরাধের শাস্তি আশি বেত্রাঘাত।

অপরাধ প্রমাণ ও হদ্দ কার্যকরীকরণ

(ক) অপরাধীর একবার স্বীকারোক্তি অথবা দুই জন বালেগ ও বুদ্ধিমান মুসলিম পুরুষ সাক্ষীর সাক্ষ্যের দ্বারা অপরাধ প্রমাণিত হতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করলে বা সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্যে মতভেদ হলে হদ্দ কার্যকর হবে না।

(খ) অপরাধীর বমন বা মুখের গন্ধ অপরাধ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়।

(গ) মাদকের নেশা কেটে যাবার পর অপরাধীর সুস্থ্ অবস্থায় তার উপর শাস্তি কার্যকর করতে হবে।

মানুষের সঠিক ও কার্যকর নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে মদ্যপানের অপরাধের হদ্দ শাস্তি কার্যকরী বিজ্ঞান সম্মত। কেননা কোন নেশাধারী দ্রব্য সমাজের মানুষের মধ্যে পরস্পর চরম শত্রুতা ও হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। আল্লাহ্‌র স্মরণ ও সালাত থেকেও মানুষকে বিরত রাখে। এছাড়া মদ পান দ্বারা মানুষের শরীরের নানা ধরনের রোগ সৃষ্টি করে। এমন কি কলিজা পর্যন্ত পঁচে যায়। মদ পানে মানুষ পশুতুল্য হয়ে যায়। সে মানুষ হত্যা, ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। মদ ক্রয়ের অর্থ সংগ্রহের জন্য স্বীয় সহায় সম্পত্তি বিক্রি করে পথে বসে।

বস্তুত এ কারণেই ইসলাম মানব জাতির সঠিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য মদ্য পান অপরাধের 'হদ্দ' এর শাস্তি নিধারিত করেছে।

৬. রাষ্ট্রদ্রোহিতা (বাগী)

ডাকাতি সম্পর্কে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনের সূরা মায়েদার ৩৩ নং আয়াতে যা বলেছেন রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ সম্পর্কে একই কথা বলেছেন।

রাষ্ট্রদ্রোহিতা কি? যদি একটি সংঘবদ্ধ দল ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং তার রাষ্ট্র প্রধানের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত এবং উচ্ছেদ করার সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং দাবী করে তারা সঠিক পথেই রয়েছে এবং তারা ধন সম্পদ লুন্ঠন করে তাহলে তাদের রাষ্ট্রদ্রোহী বলা যাবে।

শাস্তি ঃ এ অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত হতে পারে।

পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্রের আইনে রাষ্ট্রদ্রোহিতার শাস্তির ইসলাম নির্দেশিত শাস্তি মতোই।

ইসলামী রাষ্ট্র একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বা বিদ্যমান সরকারকে উচ্ছেদ একটি বড় অপরাধ। সুতরাং তার জন্য নির্ধারিত এ শাস্তি সঠিক ও যথাযথ।

৭. ইসলাম ধর্মত্যাগ (রিদ্দাহ্)

ইসলাম সত্য ধর্ম। ধর্ম ত্যাগ করা মহাপাপ বা কবীরা গুনাহ্। এর শাস্তি খুবই ভয়াবহ। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন;

"তোমাদের মধ্যে যদি কেউ স্বীয় দীন থেকে ফিরে যায় এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারী রূপে মৃত্যুর মুখে পতিত হয় দুনিয়ায় তাদের কর্ম নিস্ফল হয়ে যায়। এরাই জাহান্নামের অধিবাসী। তথায় তারা চিরদিন থাকবে। সূরা আল বাকারা : ২১৭।

রসুলুল্লাহ্ স. তাদের সম্পর্কে বলেছেন: "যে ব্যক্তি স্বীয় দীন পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর।" - সহিহ্ বুখারী

মুর্তাদ কে? ইসলাম থেকে কুফরের দিকে ফিরে যাওয়াকে রিদ্দাহ বা স্বধর্মত্যাগ বলে। যে ইসলাম ত্যাগ করে কুফুরীতে ফিরে যায় তাকে মুর্তাদ বলে।

শাস্তি ঃ রিদ্দাহ নিয়ে নানা বিতর্ক থাকলেও স্বাভাবিক নিয়মে মুর্তাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ড। শর্ত হলো সুস্থ মনে ও স্বাধীন ভাবে ঘোষণা দিতে হবে।

বিরুদ্ধবাদীরা একে মানবতা বিরোধী শাস্তির বিধান বলে আখ্যায়িত করে থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয় বরং এর বিপরীত। ইসলাম সত্য ধর্ম। মানব জনম সার্থক হওয়ার একমাত্র উপায় ইসলাম। সুতরাং এ ধর্ম কেউ পরিত্যাগ করা মানেই একমাত্র সত্য ত্যাগ এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হওয়া। তাই ইসলাম ধর্ম ত্যাগকারীর মৃত্যুদন্ড যথার্থ।

এছাড়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণে কখনো কেউ কাউকে বাধ্য করে না। মানুষ স্বেচ্ছায় গ্রহণ বা বরণ করে থাকে। যারা তা গ্রহণ করে, তারা তা ত্যাগ করার পরিধি জেনেই গ্রহণ

করে। এ কারণে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস সংরক্ষণে এ শাস্তি যৌক্তিক। অবশ্য রিদ্দাহর ধরণ ও প্রকৃতি বিচারে এ শাস্তি প্রয়োগ বা কার্যকর প্রসঙ্গটি অধিক বিশ্লেষণ অপেক্ষা রাখে।

২. কিসাস

আইনগত দিক থেকে কিসাস বলতে কোন ব্যক্তিকে হত্যা বা আহত করার দায়ে হত্যাকারীকে বা আহতকারীকে পর্যায়ক্রমে হত্যা বা আহত করাকে 'কিসাস' বলে।

কিসাস শব্দের অর্থ অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সমতা বা সাদৃশ্য বিধান।

মহান আল্লাহ বলেনঃ "হে মুমিন! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর বদলে নারী" - সূরা বাকারা : ১৭৮

"আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করিও না। কেহ অন্যায় ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি তার প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি, অতএব হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে।" সূরা বনি ইসরাঈল : ৩০

"তাদের জন্য এতে বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। সূরা মায়েদা : ৪৫

আল্লাহ্ পাক মানব জাতিকে এই কিসাসের শাস্তির বিধান অনুমোদন করে মানুষের জীবনের যে নিরাপত্তা দান করেছেন, তা অন্য কোন আইনে দেখা যায় না।

বলা হয়েছে শিরকের পর নরহত্যা সবচেয়ে বড় গুনাহ্।

আল্লাহ বলেনঃ "নরহত্যা অথবা ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম হেতু ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকে হত্যা করল।" সূরা মায়েদা : ৩২

অধিকাংশ ফকিহ্ মুসলিম আইনবিদগণের মতে হত্যাকান্ডের প্রকৃতি বিবেচনা করে হত্যাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন;

১. ইচ্ছাকৃত হত্যা
২. প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যা
৩. ভুল বশত হত্যা
৪. প্রায় ভুল বশত হত্যা
৫. কারণ বশত হত্যা।

তবে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগন হত্যাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেনঃ

(ক) ইচ্ছাকৃত হত্যা ও (খ) অনিচ্ছাকৃত হত্যা।

ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি মৃত্যুদন্ড।

হত্যাকান্ডের অপরাধে কিসাস কার্যকর করার ক্ষেত্রে কতগুলো শর্ত বিবেচনা করতে হয়;

১. হত্যাকারীর হত্যার ইচ্ছার মধ্যে কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ থাকবে না।
২. হত্যাকারী স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করবে।
৩. নিহত ব্যক্তি নিহত হবার মতো কোন অপরাধ করেনি। কেননা ইসলাম পাঁচটি ক্ষেত্রে কিসাসের আওতায় হত্যাকে বৈধ ঘোষণা করেছে। যেমন

(ক) অকারণে কাউকে হত্যাকারী, (খ) দীন ইসলামের পথে বাধা সৃষ্টিকারী, (গ) ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, (ঘ) বিবাহিত যেনাকারী নারী-পুরুষ ও (ঙ) মুরতাদ।

৪. নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ হত্যার বিচার প্রার্থী হবে
৫. হত্যাকারী নিজের শক্তি প্রয়োগপূর্বক হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে। কারোর দ্বারা প্ররোচিত হয়ে নয়।

এসব শর্তের যে কোন একটি প্রমাণিত না হলে হত্যাকারীকে হত্যার বদলে কিসাসের রায় দেয়া যাবে না। এমন হত্যাকান্ডের ক্ষেত্রে দিয়াত বা রক্ত মূল্য কার্যকর করতে হবে। সমাজের মানুষের জীবনের তথা প্রাণের নিরাপত্তা বিধান স্বরূপ আল্লাহ্ তাআলা হত্যার অপরাধের শাস্তি হিসেবে কিসাস কার্যকরী করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন; "হে বিবেক বুদ্ধিমান লোকেরা। কিসাসে তোমাদের মত জীবন নিহিত রয়েছে, সম্ভবত তোমরা তার দরুন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে।" সূরা বাকারা আয়াত-১৭৯।

হত্যার শাস্তির হিসেবে কিসাস শব্দ ব্যবহার করায় তার প্রমাণ মিলে। এখানে কিসাস শব্দটির অর্থ সমাজ সমষ্টির বিধি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা হত্যার বদলে প্রতিহিংসায় অসংযত ক্রোধ, রক্তপাতের অত্যুৎসাহ এবং তাতে অন্যদের শরীক হবার জন্য উত্তেজিত করার মতো শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। এখানে কিসাস দ্বারা হত্যার ইনসাফ পূর্ণ প্রতিকার বিধানের কথা বলা হয়েছে। জাহেলী সমাজে ও বর্তমান সমাজেও এরূপ আইনী শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে।

যদিও কিসাস এ রক্তপাত ও প্রাণ সংহার ঘটে, তবে আল্লাহর এ শাস্তির বিধান কিসাসের Spirit এ ন্যায় বিচার ও ইনসাফ এর অভিব্যক্তিই প্রকাশিত হয়েছে।

এছাড়া ইসলামী আইনে কিসাসে শাস্তির বিধান কেবলমাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু মানব রচিত আইনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ইংল্যান্ডের দন্ডবিধিতে ২২৩টি অপরাধে হত্যার দন্ড ছিল। ছোট খাট অপরাধেও মৃত্যু দন্ডের বিধান ছিল। এমন কি এক শিলিং এর থেকেও কমমূল্যবান জিনিষ চুরির জন্য মৃত্যুদন্ড দেয়া হতো।

রাশিয়াতেও চুরি, পেশাদার জালিয়াতি, নারী ধর্ষণ ও ঘুষ গ্রহণের জন্য ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদন্ডের বিধান ছিল। বর্তমান চীনে এখনো অনুরূপ শাস্তির বিধান রয়েছে।

৩. তাযির

যে সব অপরাধের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হয়নি সেই সব অপরাধের জন্য প্রদত্ত শাস্তি কে তাযির বলে।

তাযির শব্দের অর্থ প্রতিরোধ, ভর্ৎসনা, নিন্দা, তিরস্কার ইত্যাদি। কোন ব্যক্তি হদ্দের আওতা বহির্ভুত কোন অপরাধ কর্মে লিপ্ত হলে তা আল্লাহর অধিকার লংঘণ। যেমন নামায ত্যাগ করা, রোজা না রাখা, অথবা বান্দার অধিকারে হস্তক্ষেপ হোক, যেমন কাউকে মদখোর, চোর, যেনাকারী, কাফের ইত্যাদি গাল দেয়া হলে তাকে যে শাস্তি ভোগ করতে হয় মূলতঃ তাই তাযির।

অপরাধের ধরণ ও প্রকৃতি বিবেচনা করে বিভিন্ন রকমের শাস্তি ইসলামী দন্ডবিধিতে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-

১. মৃদু ভর্ৎসনা করা (আল ওয়াজ)
২. কঠোর তিরস্কার (আল তাবিজ)
৩. ভয় দেখানো, অপরাধীকে হুশিয়ার করে দেয়া (আল তাহাবিদ)
৪. সমাজচ্যুত করণ (আল হাযর)
৫. কারোর দোষ জনসমক্ষে ঘোষনা (আল তাশহীর)
৬. জরিমানা, সম্পত্তি আটক ও বাজেয়াপ্ত।
৭. কারাদন্ড (আল-হাবস), (ক) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অথবা (খ) অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য)
৮. বেত্রাঘাত, গাছের ছাল ইত্যাদি দ্বারা প্রহার (আল জানুত)
৯. মৃত্যুদন্ড (আল-তাযির বিল কতল)

অনেক ক্ষেত্রে বিচারক মূল শাস্তির সাথে প্রয়োজন মনে করলে তাযিরের শাস্তি যুক্ত করে দিতে পারেন। এটি বিচারকের স্বেচ্ছাধীন।

তাযিরের শাস্তিযোগ্য কতিপয় অপরাধ

মিথ্যা সাক্ষ্যদান, সুদ, ঘুষ গ্রহণ, ঘুষ প্রদান, আমানতের খেয়ানত, পণ্য ক্রয় বিক্রয়ে ধোকা দেয়া, ওজনে কম দেয়া, বেশী গ্রহণ করা, প্রতারণা করা, কাউকে অপমান করা, অপরাধীকে আত্মগোপনে সহায়তা করা, যেনা ব্যতীত অন্য কোন অপবাদ আরোপ, নামাজ রোজা, যাকাত প্রভৃতি ফরজ কাজ ত্যাগ ইত্যাদি অপরাধে তাযিরের শাস্তি দেয়া যেতে পারে।

জননিরাপত্তা বিধানে তাযিরের শাস্তির গুরুত্ব ঃ মানব সমাজে জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে তাযিরের শাস্তির বিধান সত্যি খুব ফলপ্রদ। কেননা হদ্দ ও কিসাস এ মাত্র কয়েকটি অপরাধের সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান করা হয়েছে। এর বাইরে হাজারও প্রকৃতির ও ধরনের অপরাধ রয়েছে বা সংঘটিত হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে ইসলামী আইন, অন্যান্য মানব রচিত আইনের মতো শাস্তির বিধান করে। বিচারকের হাতকে নির্দিষ্ট

সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেনি। বিচারক যে কোন অপরাধের নির্ধারিত অপরাধের শাস্তি ব্যতীত শাস্তি দিতে পারেন। এ থেকে বলা যায় যে, ইসলামী আইনে কোন অপরাধই শাস্তির আওতামুক্ত নয়। সকল অপরাধের শাস্তির বিধান রয়েছে। সুতরাং মানব রচিত আইনে শাস্তির বিধান থেকে ইসলামী আইনে শাস্তি বিধান অধিক জননিরাপত্তা বিধানে কার্যকর।

ইসলামী আইনে জননিরাপত্তা বিধানে দন্ড দর্শনের মর্মকথা ঃ ইসলামী আইনে জননিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় শাস্তির বিধান প্রবর্তনের উদ্দেশ্য সমাজে আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে বিচ্যুতি বা লংঘণের দরুন সৃষ্ট অবস্থার কার্যকর নিয়ন্ত্রণ, যাতে সমাজে সুবিচার ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠিত থাকে।

শাস্তি দানের ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

(ক) অপরাধীর অপরাধ প্রবণ মন শাস্তির কঠোরতা দেখে যেন শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে। শাস্তি দানের কঠোরতায় সমাজে অপরাধের সংখ্যা দ্রুততার সাথে শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। কেননা শাস্তির কঠোরতার মাত্রা যখনই কম করা হয় তখন সমাজে অপরাধের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়।

(খ) শাস্তির ভয়াবহতাঃ শাস্তিকে এমন ভাবে ভয়াবহ করে তোলা যাবে অপরাধী মনে একটা তীব্র ভীতির ভাব উদ্রেক হয় যদ্বারা অপরাধী অপরাধের পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত থাকে।

(গ) প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করাঃ অপরাধ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির মনে যে প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠে তা ইনসাফপূর্ণ বাস্তবায়নের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

সমাজ থেকে অপরাধ নির্মূলের উপরোক্ত ভাবধারা সঠিক ভাবে অর্জনে তিনটি উপায় ইসলামী আইন সুনির্দিষ্টভাবে অবলম্বন করেছে:

(ক) অপরাধমূলক কাজটি বাস্তবিকই অপরাধ হিসেবে চিন্‌হিতকরণ।

(খ) অপরাধের জন্য অনুমোদিত শাস্তি যথার্থ, এছাড়া অন্য কিছু নয়।

(গ) শাস্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের প্রতি বলিষ্ট বিশ্বাস এবং শাস্তি দান প্রক্রিয়ার যথার্থ কার্যকারিতা।

উপরোক্ত বিষয় তিনটি কেবলমাত্র ইসলামেই সম্ভব, অন্য কোন মানব রচিত আইনে নয়। বস্তুত এ কারণে মানব রচিত আইনে অপরাধমূলক কর্মকান্ড চিন্‌হিত, তার শাস্তি র প্রকৃতি ও মাত্রা খুবই পরিবর্তনশীল হওয়ায়, অপরাধীকে শাস্তিদানের বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্থ ও অপরাধী কারোরই কোন দূর আস্থা থাকে না। দুর্নীতি ও অন্যান্য আনুকূল্যের কারণে শাস্তি প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের প্রতি শাস্তি ভোগকারীর বলিষ্ট কোন আস্থা থাকে না। এক্ষেত্রে শাস্তিদানের যে প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তা বহুলাংশে অপরাধের প্রশিক্ষণ এবং অপরাধ নিবৃত্তিমূলক শিক্ষা বর্জিত। বস্তুত এ কারণে মানব রচিত আইনে

জননিরাপত্তা বিধানে শাস্তির বিধান একটি হাস্যকর উদ্যোগ বলে বিবেচিত হয়।
দ্বিতীয়তঃ সমাজের মানুষের প্রয়োজন পূরণের নিরাপত্তা বিধানের পদক্ষেপ ঃ মানুষকে আল্লাহ্ এই পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধির দায়িত্ব দিয়ে আনুগত্যের পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করেছেন।
রাষ্ট্রীয় সামাজিক জীবনে মানুষের নিরাপত্তার বিষয়টি মূলত মানুষের এই দায়িত্বের পরীক্ষার সফলতা ও ব্যর্থতার মধ্যে বিস্তৃত।
আল্লাহ্ পাক তাঁর সকল সৃষ্টিকে একমাত্র তাঁর-ই ইবাদত বা আনুগত্য করার জন্য সৃষ্টি পূর্বক আনুগত্যের জন্য যে সব উপকরণ ও বিধান প্রয়োজন তারও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করেছেন। মানুষ ছাড়া সকল সৃষ্টির ক্ষেত্রে তা স্বয়ত কষ্টকর বিধায় সকল সৃষ্টির মানুষ ব্যতীত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত। এ জন্য তাদেরকে কারোর মুখাপেক্ষী হতে হয় না বা তাদের নিরাপত্তা অন্য কোন সৃষ্টির মর্জির উপর নির্ভরশীল নয় বা কেউ তাতে হস্তক্ষেপ করে না। আল্লাহ্ বলেনঃ
"যমিনে বিচরণশীল কোন জীব এমন নেই, যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর নয়, আর যার সম্বন্ধে তিনি জানেন না যে, কোথায় সে থাকে এবং কোথায় তাকে সোপর্দ করা হয়। সব কিছু এক লিপিকায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।" সূরা হূদ : ৬।
আল্লাহ্ পাক তাঁর সকল সৃষ্টির রিযিক অর্থাৎ জীবন নির্বাহের অপরিহার্য উপকরণ যথাযত ভাবে যোগানের ব্যবস্থা করেছেন। অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় মানুষের জীবন নির্বাহের জন্যও প্রয়োজনীয় রিযিক আল্লাহ্ পাক যোগান বা বরাদ্ধ করেছেন; কিন্তু তা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আনুগত্যের দায়িত্ব পালন স্বরূপ আল্লাহর দেয়া বিধান মোতাবেক বন্টন পূর্বক ভোগ ব্যবহার করার মধ্যে তাদের প্রয়োজন পূরণের নিরাপত্তা নিহিত।
মানব জাতির রিযিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আল্লাহর বিদান ঃ
"যেই আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তোমাদের ভেতর থেকে কাউকে কারোর চাইতে উঁচু মর্যাদা দিয়েছেন। যেন তিনি তোমাদেরকে যা কিছু দান করেছেন তার ভেতর তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন।" সূরা আল আনয়াম : ১৬৫
"সম্পদ যেন কেবল ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়।" সূরা আল-হাশর।
"যারা স্বর্ণ রৌপ্য, টাকা পয়সা সঞ্চয় করে রাখে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না তাদের কঠিন আযাবের সংবাদ দাও।" সূরা আত তওবা : ৩৪
"আর তাদের অর্থ সম্পদে অধিকার রয়েছে প্রার্থীদের (সাহায্য প্রার্থী) ও বঞ্চিতদের"। সূরা যারীয়াত : ১৯
"আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর"। সূরা বাকারা : ২৮৪
"প্রার্থীদের প্রত্যেকের প্রয়োজন পরিমান খাদ্য সামগ্রী সঞ্চিত করে রেখেছেন।" সূরা আস সাজদা: ১০

উপরোক্ত আয়াত সমূহ হতে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের রিযিক অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সম্পদ রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে আল্লাহর দেয়া বন্টন নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে প্রত্যেকের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

মানব সমাজে মানব প্রকৃতির প্রেক্ষিত প্রত্যেকের উপার্জন ক্ষমতা এক নয়। কেউ অধিক উপার্জন করে, কেউ পরিমিত, কেউ কম, কেউ একেবারেই নয়। এই বিচিত্র উপার্জনক্ষম লোকদের মাঝে ইনসাফ পূর্ণ বন্টন নীতি অবলম্বন পূর্বক প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবস্থা করাই হলো ইসলামী রাষ্ট্রীয় সমাজের প্রধান দায়িত্ব। রাষ্ট্রকে এজন্য অর্থাৎ জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রধানতঃ দু'টি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ক. মানুষের প্রয়োজন নির্ধারণ;

খ. সমাজের সম্পদের ইনসাফপূর্ণ বন্টন নীতি অবলম্বন।

ক. মানুষের প্রয়োজন নির্ধারণ ঃ মানুষের প্রয়োজন সম্পর্কে ইমাম শাতিবী ও ইমাম গাযালী রহ. একটি সুন্দর নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁরা মানুষের প্রয়োজনকে তিনটি ক্রমিক স্তরে বিন্যাস করেছেন। এগুলো হলো;

১. মৌলিক চাহিদা

২. স্বাচ্ছন্দ্যমূলক

৩. সৌন্দর্য্য মূলক

এখানে রাষ্ট্রকে প্রথম প্রয়োজনটি পূরণে দায়িত্ব নিতে হবে। অবশিষ্ট দু'টি স্ব-স্ব ব্যক্তি স্বীয় উদ্যোগ পূরণে প্রবৃত্ত হবে।

মৌলিক চাহিদার মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত:

১। বিশ্বাস ও আদর্শঃ ঈমান, দীন ও আদর্শ।

২। জীবন ধারন্যে জন্য আবশ্যক ঃ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, পরিবেশ, যানবাহন, বিশুদ্ধ পানি, অবসর ইত্যাদি।

৩। পারিবারিক প্রয়োজন: পরিবার গঠন ও সংরক্ষণ।

৪। আকল : শিক্ষা ও বুদ্ধি মত্তার বিকাশ।

৫। সম্পত্তি ঃ ন্যূনতম পরিমাণ

৬। স্বাধীনতা ঃ চিন্তা, বিবেক অনুশীলন স্বাধীনতা।

সমাজে বসবাসকারী মানুষের অবস্থা মূল্যায়নান্তে প্রত্যেকের উপরোক্ত চাহিদা নিরুপণ পূর্বক, তা পূরণে কার কি সহযোগিতা প্রয়োজন তা নির্ণয় এবং তদানুযায়ী সহায়তা পরিকল্পনা ও কর্মসূচী অবলম্বন ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তির অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

এক্ষেত্রে সমাজে চার শ্রেণীর লোকের সন্ধান পাওয়া যায়। (ক) ধনীক শ্রেণী, (খ) পরিমিত উপার্জনক্ষম, (গ) মিসকিন ও (ঘ) ফকির।

মিসকিন তাদেরকে বলা হয় যারা তাদের উপার্জন দ্বারা প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না। এবং ফকির তাদেরকে বলা হয় যাদের কিছুই নেই বা চরম দরিদ্র।

খ. সম্পদের ইনসাফ পূর্ণ বন্টন নীতি অবলম্বন

ইসলাম সম্পদের খোদাপ্রদত্ত ট্রান্সফার ম্যাকানিজম অবলম্বনপূর্বক সমাজে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন ও সহায়তা করে:

রাষ্ট্র যদি যাকাত, উশর কাফফারা ও সাদাকাহ খাত থেকে অর্থ সংগ্রহ করে দরিদ্র জনগণের মধ্যে সুষম বন্টন করে তাহলে সমাজে কোন অভাবীই থাকবে না। তখন রাষ্ট্রের সংগতিবান প্রত্যেকেই যাকাত আদায়ের শ্রেণীভুক্ত হবে। রাসুলুল্লাহ (স.) এবং তদপরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদার শাসন আমলে যাকাত গ্রহণকারী ছিলই না। যদিও কোন ব্যক্তি থেকে থাকে তবে তারা যাকাত গ্রহণে আদৌ আগ্রহী ছিল না। ইসলামী অর্থনীতির সম্পদ ট্রান্সফার ম্যাকানিজম জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মানব রচিত ব্যবস্থায় এরূপ বৈশিষ্ট্য নেই, বরং এ বৈশিষ্ট্যের বিপরীত তা হলো অনুদিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হওয়া।

পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় অর্থ সম্পদের মালিক মানুষ যে উপার্জন করে, এই অর্থ কেবল তার প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে ব্যবহৃত হবে। তাতে অন্যের কোন অধিকার নেই। অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে কোন নীতি-নৈতিকতার বালাই নিষেধ নেই। এতে সমাজের অক্ষম ও অসহায় ব্যক্তিদের প্রয়োজন পূরণের মতো কোন সম্পদ থাকে না। তাই তাদের জীবনে কোনই অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নেই। অর্থশালী ব্যক্তিরাই সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত থাকায় তারা এসবকে কেবল স্বার্থোদ্ধারের কাজে ব্যবহার করে। ফলে রাষ্ট্রত্ব সকল সংগঠন দরিদ্র মানুষের জন্য নিপীড়ণ ও জুলুমের হাতিয়ারে পরিণত হয়। দরিদ্র জনগণ বেঁচে থাকার তাগিদে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে জুলুমের শিকার হয়।

পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় অর্থ হস্তান্তর প্রক্রিয়া এমন ভাবে প্রণীত ও বিন্যস্ত যাতে সকল অর্থ সম্পদ ধনীদের হাতেই পুঞ্জিভূত হয়।

উপসংহার

কোন রাষ্ট্রীয় সমাজে বসবাসকারী জনগণের মৌলিক চাহিদা ইনসাফ পূর্ণভাবে পূরণের মধ্যেই কার্যত: তাদের নিরাপত্তা নিহিত। প্রতিটি রাষ্ট্রীয় সমাজে বসবাসকারী তাদের কৃষ্টি অনুযায়ী পরিশীলনীয় নিরাপত্তার বিধান প্রবর্তন করেছে। এ সব নিরাপত্তার বিধানের মধ্যে কেবলমাত্র ইসলামেই যথার্থ ও সামগ্রিক নিরাপত্তা বিদ্যমান। যুক্তি ও বাস্তবতার নিরীখে বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে একথার যথার্থতা প্রমাণিত হয়। বর্তমান রচনায় এর কিছুটা আলোকপাতে সচেষ্ট হয়েছি। প্রত্যাশা, সংশ্লিষ্টজনেরা বিষয়টি একটু ভেবে দেখবেন।

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ঃ ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ১৯, পৃষ্ঠা ঃ ৭৯-৮৪

ইসলামে পানি আইন

মো. নূরুল আমিন

॥ এগারো ॥

মালয়েশিয়ার প্রদেশসমূহের মধ্যে কেদাহ, কেলান্‌তান এবং পার্লিস গৃহস্থালী ও অন্যান্য কাজে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ফেডারেল সরকার প্রণীত পানি আইনকে হুবহু অনুসরণ করছে।

অন্যদিকে সারাওয়াক রাজ্য ফেডারেল আইন অনুসরণের পাশাপাশি নিজস্ব আইনও অনুসরণ করে। এই আইন অনুযায়ী গণপূর্ত বিভাগের পরিচালক, রাজ্য গভর্নর কর্তৃক গঠিত ওয়াটার বোর্ডের অথবা অন্য কোনও বিভাগ ও এজেন্সির কর্মকর্তাদের উপর পানি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে দায়িত্ব অর্পণ করার ব্যবস্থা রয়েছে। এই আইনের অধীনে প্রণীত কারিগরি বিধিমালায় সরবরাহকৃত পানি পরিমাপের জন্য বাধ্যতামূলক মিটার পদ্ধতি ব্যবহারের বিধান রাখা হয়েছে। পানি সরবরাহের শর্ত ভঙ্গ করলে পৌর কর্তৃপক্ষকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ক্ষমতাও দেয়া হয়েছে। এই রাজ্যের আইন অনুযায়ী হিটিং কার্যক্রম ছাড়া ওয়াটার কুল্‌ড রেফ্রিজারেশান সামগ্রী, ওয়াটার ফেড যন্ত্রপাতি পরিচালনা, হাসপাতাল ল্যাবরেটরী, খাবার পানি বিশুদ্ধকরণ কারখানা, শিল্পস্থাপনা প্রভৃতিতে ব্যবহারের জন্য পানি সংযোগ নিতে হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি নিতে হয়।

সাবাহ্ প্রদেশে ফেডারেল আইন অনুরসরণ করা হয়। এই আইনে প্রাকৃতিক বা অন্য কোন কারণে অথবা পানি সরবরাহ স্থাপন ও শোধানাগারে কোনও বিপর্যয় দেখা দেয়ার কারণে পানির সংকট দেখা দিলে কিংবা পানিতে দূষণ দেখা দিলে ওয়াটার অথরিটি পানি সরবরাহ স্থগিত, নিয়ন্ত্রণ অথবা বন্ধ করে দিতে পারেন। একইভাবে এই আইন অনুযায়ী সরকারী বা বেসরকারীভাবে ষ্ট্যান্ড পাইপের সাহায্যে পানি সরবরাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কৃষি কাজে পানি ব্যবহারের লক্ষ্যে ফেডারেল আইন অনুযায়ী নদী-নালা, খাল-বিল তথা পানির প্রাকৃতিক উৎস থেকে পানি প্রত্যাহার করার বিধান রয়েছে। ধানসহ খাদ্য শস্য উৎপাদনের জন্য অবশ্য পানি প্রত্যাহার করতে হলে সরকার থেকে লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক। জহোর, কেলান্তান এবং ট্রেনগানু প্রভৃতি প্রদেশেও এই বিধান চালু আছে এবং প্রাদেশিক বা রাজ্য আইন তা নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়াও পানি সরবরাহ এলাকায়

লেখক : সম্পাদক, থট্‌স অন ইকোনমিক্স, আইইআরবি এবং সহকারী সম্পাদক, দৈনিক সংগ্রাম

অবস্থিত ক্ষেত খামারে কৃষি ও ফলমূল চাষের জন্য পানি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও রাজ্য প্রকৌশলীর অনুমোদন নিয়ে বেসরকারীভাবে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে রাজ্য প্রকৌশলী পানি সরবরাহ হ্রাস বা বন্ধ করে দেয়ার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। এ ধরনের বেসরকারী সরবরাহের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত চার্জ প্রযোজ্য। কেদাহ, কালান্তান ও পার্লিশ রাজ্যেও এ বিধান কার্যকর রয়েছে।

পানি সরবরাহের পর্যাপ্ত সুযোগ সম্পন্ন সেচ এলাকার জমির সরবরাহ সুনির্দিষ্ট ফেডারেল আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সেচ প্রকল্প থেকে পানি নিতে হলে পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকৌশলীর অনুমোদন প্রয়োজন হয়। সেচের পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে জমির মালিক অথবা চাষীকে বার্ষিক ভিত্তিতে কর পরিশোধ করতে হয় এবং পানি নেয়ার আগে বাধ্যতামূলকভাবে তাকে পানি সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আইল বা বাঁধ দিতে হয় যাতে পানির অপচয় না হয়। সন্নিহিত অথবা সেচ বহির্ভুত জমির উপর দিয়ে পানি চলাচলে কেউ বাধার সৃষ্টি করলে তাকে প্রচলিত আইন অনুযায়ী শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারীভাবে সেচ স্থাপনাসমূহকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

মৎস্য চাষ

সেচ ও নিষ্কাশন এলাকায় মাছের চাষ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ফেডারেল সরকারের সুনির্দিষ্ট আইন রয়েছে। সেচের জন্য খননকৃত দিঘী ও জলাশয় এবং খাল ও নালায় জাল বা অন্যান্য যন্ত্রপাতি দিয়ে মাছ ধরা নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে জাল বা মাছ ধরার ফাঁদ দিয়ে নিষ্কাশন এলাকায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে মাছ ধরা বৈধ। এছাড়াও এই এলাকায় মাছের পোনা উৎপাদন, মাছ চাষ ও মাছ ধরার জন্য উন্নয়ন তহবিল থেকে বিশেষ অর্থ সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে।

নদ-নদী ও জলাশয়ে মাছ চাষের জন্য রাজ্য আইনের অধীনে লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। আবার এর কোনও শর্ত ভঙ্গ করলে এই লাইসেন্স বাতিল করার অধিকারও এই আইন সংরক্ষণ করে। রাজ্যের নিষ্কাশন ও সেচ প্রকৌশলী এই লাইসেন্স ইস্যু করেন এবং এই লাইসেন্সের শর্তাবলীও তিনিই নির্ধারণ করে থাকেন। মৎস্য লাইসেন্স বাতিল হলে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য হয় না।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও শিল্পকাজে পানি ব্যবহার

মালয়েশিয়ার ফেডারেল আইনে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও শিল্প কারখানায় ব্যবহারে জন্য প্রাকৃতিক জলাশয় ও নদী নালা থেকে পানি তুলে আনতে হলে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয়। জাহোর, কেলান্তান ও ট্রেনগানুসহ সকল রাজ্য তাদের স্থানীয় আইনে এই নীতি অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। অনুরূপভাবে শিল্প ও ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহারের জন্য সরবরাহ এলাকার কোনও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি পানি নিতে চাইলে ফেডারেল আইন অনুযায়ী ওয়াটার বোর্ডের চেয়ারম্যান ও রাজ্য প্রকৌশলীর পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হয়। সংশ্লিষ্ট রাজ্য আইনে জনস্বার্থে পানি সরবরাহে হ্রাস-বৃদ্ধি, পানি ব্যবহারের উপর কর আরোপ এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়ার বিধানও রয়েছে। কৃষির ন্যায় পানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পানি সরবরাহের জন্য সরকারের উন্নয়ন তহবিল

থেকে বিশেষ আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে। অবশ্য পানি বিদ্যুৎ স্কীম পরিকল্পনা, নির্মাণ, পরিচালনা ও সংরক্ষণের দায়িত্ব হচ্ছে ন্যাশনাল ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের।

খনিজ পদার্থের উত্তোলন

ফেডারেল আইন অনুযায়ী খনিজ কাজে পানি ব্যবহারের বিষয়টি ভূমি ও খনি মন্ত্রণালয়ের খনি বিভাগ এবং কৃষি সমবায় মন্ত্রণালয়ের পানি নিষ্কাশন ও সেচ বিভাগ যৌথভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। রাজ্য আইনের অধীনে এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করা হয়। যেমন, সাবাহ রাজ্যের খনি আইন অনুযায়ী খনিজ কাজে ব্যবহারের জন্য নদী, খাল, বিল, স্রোতস্বিনী বা অপরাপর যে কোন জলাশয় থেকে পানি নিতে হলে গণপূর্ত বিভাগের পরিচালকের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করতে হয়। এই অনুমতির শর্তাবলী কেস টু কেস ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করেন।

নৌ-পরিবহন ও পানির স্বত্ব নিয়ন্ত্রণ

সেচ এলাকায় নৌকা, ভেলা, লঞ্চ, ষ্টীমার বা অন্য কোন ভাসমান যান ব্যবহার করতে হলে মালয়েশিয়ার প্রত্যেকটি রাজ্যে নিষ্কাশন ও সেচ প্রকৌশলী অথবা তার ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছ থেকে পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হয়। এই ধরনের অনুমতি সম্পূর্ণভাবে অস্থায়ী ভিত্তিতে প্রদান করা হয় যা সুনির্দিষ্ট নিষ্কাশন এলাকার বেলায় প্রযোজ্য। নিষ্কাশন এলাকার খাল বা নালার মধ্য দিয়ে বাঁশ বা কাঠ ভাসিয়ে নেয়ার জন্যও সরকারী অনুমোদন নেয়া অপরিহার্য। আবার অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ফেডারেল এবং রাজ্য উভয় আইনে আর্থিক সাহায্য প্রদানের বিধান রয়েছে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ

মালয়েশিয়ার ফেডারেল আইনে নদীর তীরে অবস্থিত যে সমস্ত জমির (lands riparian to rivers) বন্যার সময় পানি ধারণ ক্ষমতা অপর্যাপ্ত বলে গণ্য করা হয় সে সমস্ত জমিকে বন্যা চ্যানেল হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রত্যেকটি রাজ্যের রাজ্য প্রশাসক অবস্থা বুঝে নদীর যে কোন বা উভয় তীরের জমিকে রাজকীয় ডিক্রীর মাধ্যমে বন্যা চ্যানেল হিসেবে ঘোষণা করতে পারেন। ঘোষণাকারী কর্তৃপক্ষ বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে যে কোনও সময় এই ঘোষণা বাতিলও করতে পারেন। বন্যা চ্যানেল ঘোষণার কয়েকটি তাৎপর্য রয়েছে। ঘোষিত চ্যানেল এলাকায় কোনও ইমারত বা পাঁকা কাঠামো তৈরী করতে হলে সরকারের অনুমতি গ্রহণ করতে হয়। এতে ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের খরচে তা ভেঙ্গে ফেলতে হয়। নদ-নদী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় দায়িত্ব কৃষি ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত নিষ্কাশন ও সেচ বিভাগের। রাজ্য পর্যায়ের এই দায়িত্ব বিকেন্দ্রীকরণ নীতির আওতায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত করা হয়। যেমন, জাহোর রাজ্যে ল্যান্ডস এন্ড মাইনস কমিশনার এই দায়িত্ব পালন করেন।

ভাঙ্গন ও ক্ষয়রোধ

নদী, নালা, খাল প্রভৃতির মধ্য দিয়ে পানি প্রবাহের ফলে সরকারী কিংবা বেসরকারী ভূমি যদি ভাঙ্গনের কবলে পড়ে তা হলে তা রোধ করার দায়িত্ব সরকারের। এ প্রেক্ষিতে নতুন খাল বা নালা খননের সময় ফেডারেল ও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে পর্যাপ্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। এজন্য ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়টি স্বৈরতান্ত্রিক হয় না বরং খাল বা নালা

খননের জন্য অধিগ্রহণের প্রস্তাবাধীন জমির মালিকদের আপত্তি শুনানীর ব্যবস্থা করা হয়। আপত্তি সত্ত্বেও যদি সরকারী এজেন্সিগুলো বৈধ যুক্তিকে অবজ্ঞা করেন তা হলে বিদ্যমান আইনে হাইকোর্টে আপীলের ব্যবস্থা রয়েছে।

মালয়েশিয়ার অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে নদী বা খালের মূল স্রোতধারা যদি তার মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত না হয়ে তীর ঘেঁষে প্রবাহিত হয় তাহলে পাড়ের অবতল অংশে (concave side) স্রোত আঘাত করে। এতে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয় এবং জমি ও বাড়ী-ঘর নদীতে তলিয়ে যায়। এই অবস্থা মোকাবেলার জন্য ফেডারেল ও রাজ্য আইনে নদী ও খালের নাব্যতা রক্ষা এবং মূল স্রোতধারাকে যথাযথ পথে প্রবাহিত করার জন্য নিয়মিত খনন ও সংরক্ষণের বিধান রাখা হয়েছে। উন্নয়ন তহবিলে প্রতি বছর এই খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দও থাকে।

তদুপরি জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য পানি নিষ্কাশন এবং সেচের কাজে এই পানির ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্যও সরকারীভাবে নিষ্কাশন চ্যানেল, বন্যা নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ও সেচ কাঠামো তৈরী করা হয়। পাশাপাশি সংরক্ষিত এলাকার মাছ চাষকে উৎসাহিত করা হয়।

পানির ব্যবহার, গুণাগুণ সংরক্ষণ ও দূষণ রোধ

পানির অপব্যবহার ও অপচয় রোধের জন্য মালয়েশিয়ার ফেডারেল আইনের বিধানসমূহ অত্যন্ত স্পষ্ট। এই আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকার নির্ধারিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া গৃহস্থালী বহির্ভূত যে কোনও কাজে ষ্ট্যান্ড পাইপ বা ঝরনায় পানি সরবরাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একইভাবে রাজ্য প্রকৌশলীর নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনার অধীনে পরিচালিত পানি শোধনাগারসমূহের পানি অপচয়ও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গৃহস্থালী কাজের জন্য সরবরাহকৃত পানি অন্য কোনও কাজে ব্যবহার করা হলে তাকে অপচয় বলে গণ্য করা হয় এবং প্রচলিত আইনে এটি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সেচ এলাকায় সরবরাহকৃত পানি জমির মালিক বা চাষীদের বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহার করতে হয়। এই পানি ব্যবহার না করে তারা অন্য উৎস থেকে পানি এনে ব্যবহার করতে পারেন না।

কেদাহ, কেলান্তান এবং পার্লিশ রাজ্যে ফেডারেল আইনের উপরোক্ত বিধানসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে রাজ্য আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

গ্রহস্থালী কাজে ব্যবহার, পানি সেচ ও অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য সরবরাহকৃত পানি দুষণ রোধের জন্য ফেডারেল আইনে পর্যাপ্ত বিধি-নিষেধ আরোপের ব্যবস্থা রয়েছে। যে সমস্ত জলাশয় থেকে পানি নিয়ে পরিশোধন করা হয় সে সমস্ত জলাশয়ে গোসল করা ও কাপড় কাঁচা নিষিদ্ধ। একইভাবে সেচ নালায়ও কাপড় কাঁচা এবং মানুষ ও গবাদী পশুর গোসল নিষিদ্ধ। এছাড়াও পরিবেশ আইন অনুযায়ী লাইসেন্স ছাড়া অভ্যন্তরীণ নদ-নদী ও জলাশয়সমূহে বর্জ নিক্ষেপ নিষিদ্ধ তবে লাইসেন্স প্রাপ্তরাও গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি অতিক্রম করতে পারেন না। স্বাস্থ্য রক্ষা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ফেডারেল ও রাজ্য সরকার সমভাবে উদ্বিগ্ন। গৃহস্থালী বা সেচের পানি নষ্ট করতে পারে এ ধরনের সকল পদার্থকে চিহ্নিত করে সেগুলো যাতে পানিতে না পড়ে এমনকি জলাশয়ের মধ্যে তলানী সৃষ্টি করতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। নৌ-পথে নৌ-যানের বর্জ

বিশেষ করে, তেল মবিল নিঃসরণের ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তা সুরাহার জন্য সেখানে আলাদা আইন রয়েছে।

ভূগর্ভস্থ পানি সংক্রান্ত আইন

ফেডারেল পর্যায়ে মালয়েশিয়ায় ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন ও ব্যবহার সংক্রান্ত কোনও আইন নেই। ফলে ভূমির মালিক ও ব্যবহারকারীরা কোনও প্রকার পূর্বানুমতি বা লাইসেন্স পারমিট ছাড়াই কূপ খনন করে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন ও ব্যবহার করতে পারেন। অবশ্য সাবাহ রাজ্যে পানি সরবরাহের ঘোষিত এলাকায় ভূউপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ উভয় প্রকার পানি সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য আইনের সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে।

পানি সম্পদ সংক্রান্ত সরকারী প্রতিষ্ঠান ও তার দেখাশোনা

মালয়েশিয়ার শাসনতন্ত্রে ফেডারেল ও রাজ্য সরকারের দায়িত্ব ও কর্ম-পরিধি সুনির্দিষ্টভাবে ভাগ করে দেয়া হলেও কার্যতঃ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য ফেডারেল ও রাজ্য পর্যায়ে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান ও বিভাগের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বিভাজন করে দেয়া হয়েছে। ফলে রাজ্য সরকারের বহু বিভাগ ও এজেন্সি প্রকৃত পক্ষে ফেডারেল সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও এজেন্সিসমূহের কাউন্টার পার্টে পরিগণিত হয়েছে। কোন কোন বিভাগ রাজ্য ও ফেডারেল উভয় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে।

মালয়েশিয়ায় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও এজেন্সিগুলো নিম্নরূপঃ

১. পানি নিষ্কাশন ও সেচ বিভাগ

এই বিভাগটি মিনিস্ট্রি অব ন্যাশনাল ও রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্টের অধীনে পরিচালিত। এর দায়িত্ব নিম্নরূপঃ

নদী-নালা ও জলাশয়ের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং খনিজ কাজের স্বার্থে নদীর গতি পরিবর্তন;

পানি নিষ্কাশন ও সেচ স্কীমের সংরক্ষণ ও পরিচালনা;

বিদ্যমান এলাকায় ধান উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানি নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধার উন্নয়ন

স্ট্রীম গজিং, ষ্টেজ অবজার্ভেশানসহ পানির স্তর ও প্রবাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।

২. গণপূর্ত বিভাগ

পূর্ত, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রনালয়ের অধীনে পরিচালিত এই বিভাগটির কাজ হচ্ছে পানি সরবরাহ নেটওয়ার্কের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং সরবরাহ কেন্দ্রের সংরক্ষণ ও পরিচালনা কাজের তদারক করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন পদ্ধতি নির্মাণ ও পরিচালনা। সাবাহ এবং সারাওয়াক রাজ্যে এই আইন অনুসরণ করা হয়। পক্ষান্তরে অন্যান্য রাজ্যে কেন্দ্রীয় পয়ঃ পদ্ধতির সুযোগ সীমিত এবং বর্জ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজ।

৩. মৎস্য বিভাগ

এই বিভাগটি জাতীয় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রনালয়ের (Ministry of National and Rural Development) অধীনস্থ একটি দফতর। মিঠা পানি ও লোনা পানিতে মাছ চাষের সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন হচ্ছে এই বিভাগের প্রধান কাজ।

৪. খনি বিভাগ

ভূমি ও খনি মন্ত্রনালয়ের অধীনে এই বিভাগটি পানি নিষ্কাশন ও সেচ বিভাগের সাথে যৌথভাবে খনিজ পদার্থ উত্তোলনে সহযোগিতা করার জন্য স্রোত ধারার পরিবর্তন, পলি পড়া রোধ ও স্রোত প্রবাহ পরিষ্কার রাখার জন্য কাজ করে। একই মন্ত্রনালয়ের অধীন জিওলজিক্যাল সার্ভে বিভাগ ভুগর্ভস্থ পানি সম্পদ নির্ণয়ে উপদেষ্টা সার্ভিস দিয়ে থাকে। বলা বাহুল্য মালয়েশিয়া ফেডারেশনের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পানি ও অপরাপর প্রাকৃতিক সম্পদকে রাজ্য সরকারের আওতাভুক্ত বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বন মন্ত্রনালয়ের অধীন বন বিভাগ বনজ সম্পদ ও জলাশয় বিশেষ করে, হাওর, বাওর ও বিল উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করে। একইভাবে নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের দায়িত্ব পরিবহন মন্ত্রনালয় সরাসরি পালন করে। তবে এর অধীনস্থ আবহাওয়া অধিদফতর বিভিন্ন স্থানে অবজার্ভেটরী স্থাপনের মাধ্যমে আবহাওয়ার অবস্থা এবং বৃষ্টিপাত, বন্যা, ঘুর্ণি ঝড় প্রভৃতি সম্পর্কে পূর্বাভাস প্রদান করে সরকার ও জনগণকে সতর্ক করে দেয়ার দায়িত্ব পালন করে। মালয়েশিয়ার পানি সম্পদ উন্নয়ন, এর ব্যবহার ও সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রনের জন্য ফেডারেল সরকারের ১৪টি আইন এবং রাজ্য সরকারের ১৩টি বিধিমালা প্রণিধানযোগ্য। এ সংক্রান্ত ফেডারেল আইনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আইন নিম্নরূপ ঃ

A. The Water Enactment, No. 9 of 1920 as amended by Enactment No. 36 of 1933.
B. The Water Supply Enactment, No. 3 of 1932, as amended by Enactments No. 13 of 1934 and I of 1948.
C. The Water Supply (Extension to the Settlements and Amendment) Ordinance, No. 44 of 1955.
D. The Irrigation Areas Ordinance, No. 13 of 1953.
E. The Drainage Works Ordinance, No. 20 of 1956.
F. The Development Fund Ordinance, No. 18, of 1958.
G The Land Conservation Act, No. 3 of 1960.
H. The Land Acquisition Act, No. 34 of 1960.
I. The Land Development Ordinance, No. 20 of 1956.
J. The Fisheries Act, No. 8 of 1965.
K. The National Land Code Act, No. 56 of 1965.
L. The Farmers Organization Act, No. 109 of 1975.
M. The Farmers Organization Authority Act, No. 110 of 1973.
N. The Environmental Quality Act, 1973.

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ঃ ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ১৯, পৃষ্ঠা ঃ ৮৫-১০২

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস

মানব সভ্যতার গোড়াপত্তনে আল্লাহর বিধান প্রয়োগ

ড. মুহাম্মদ নজীবুর রহমান

॥ চার ॥

হযরত ইবরাহীম আ.

হযরত সালিহ্ আ.-এর পর দুনিয়াবাসীকে হেদায়েতের পথ দেখাবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম আ. কে প্রেরন করেছেন। ঐতিহাসিক ইব্ন ইসহাক-এর বর্ণনা মতে হযরত নূহ্ আ. ও ইবরাহীম আ.-এর মধ্যখানে মাত্র দুইজন নবী হূদ আ. ও সালিহ্ আ. আগমন করেছিলেন। তাঁদের সময়কাল শেষ হবার পর মানুষ যখন চরম গোমরাহী ও শিরক-এ লিপ্ত হলো, এক আল্লাহ্র পরিবর্তে মূর্তি পূজা ও নক্ষত্র পূজায় নিমগ্ন হলো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে সুপথে আনবার জন্য হযরত ইবরাহীম আ.-কে নবী ও রসূল রূপে প্রেরণ করার ইচ্ছা করলেন। এমতাবস্থায় জ্যোতিষী ও গণকগণ তৎকালীন পরাক্রমশালী বাদশাহ নমরূদের নিকট গিয়ে বললো, আমরা আমাদের গণনার মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি যে, আপনার এই অঞ্চলে অমুক বছরের অমুক মাসে ইবরাহীম নামে একটি শিশু জন্ম গ্রহণ করবে। সে আপনার ধর্ম ধ্বংস করে ফেলবে এবং মূর্তি ভেঙ্গে ফেলবে। আপনার রাজত্বের বিলুপ্তি ও তার দ্বারাই হবে। কোন কোন বর্ণনায় আছে, তারা বলেছিল, এ তথ্য তারা পূর্ববর্তী নবীদের গ্রন্থে পেয়েছে। (আত-তাবারী, তারীখ, খ. ১, পৃ. ১২০)।

অতঃপর গণকদের বর্ণনাকৃত সেই বছরের সেই মাস শুরু হলে নমরূদ তার এলাকার প্রত্যেক গর্ভবর্তী মহিলার নিকট একজন করে লোক প্রেরণ করলো। সে উক্ত মহিলার প্রতি নজর রাখতে লাগলো। অতঃপর যখনই কোন মহিলা কোন পুত্র সন্তান প্রসব করতো তখনই নমরূদের নির্দেশে তাকে হত্যা করা হতো। কিন্তু আযরের স্ত্রী, ইবরাহীম আ.-এর মাতার ব্যাপারটি ছিল ভিন্ন। তিনি অল্প বয়স্কা

লেখক ঃ সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

থাকয় তাকে দেখে গর্ভবর্তী বলে মনেই হতো না। তাই নমরূদের মোতায়েন কৃত লোক কেউই তাঁর গর্ভের ব্যাপারটি আঁচ করতে পারেনি। ইব্রাহীম আ.-এর মাতা যখন প্রসব বেদনা অনুভব করলেন তখন নিকটস্থ পর্বত গুহায় চলে গেলেন, সেখানে ইবরাহীম আ. জন্মগ্রহন করলেন। অতপর প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সম্পাদন করত গুহার মুখ বন্দ করে তিনি বাড়ী ফিরে আসতেন। এর পর তিনি গুহার গিয়ে তাঁকে দেখে আসতেন। তিনি যখনই যেতেন দেখতেন যে, ইবরাহীম জীবিত আছেন এবং স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলী চোষণ করছেন। আল্লাহ তা'আলা এই চোষনের মাধ্যমেই তাঁর রিযকের ব্যবস্থা করেছিলেন। (আত-তাবারী, তারীখ, খঃ১, পৃ. ১৪৯-১২০)। আযর তার স্ত্রীকে গর্ভ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি সতর্কতার জন্য বলেছিলেন, আমি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেছিলাম, কিন্তু সে মৃত্যুবরণ করেছে। আযর স্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করে চুপ হয়ে গিয়েছিল। ইবরাহীম আ. পাহাড়ের গুহায় খুব দ্রুত বড় হয়ে ওঠেন। তাঁর বয়ঃবৃদ্ধির সময় কালকে আল্লাহ তা'আলা খুবই বরকতময় করে দেন। তাই তাঁর একদিন ছিল একমাসের ন্যায়, একমাস ছিল এক বছরের ন্যায়। তিনি উক্ত পর্বত গুহায় মোট ১৫ মাস ছিলেন। একদা তাঁর অনুরোধে তাঁর মা তাঁকে রাত্রিবেলায় বাইরে নিয়ে আসেন। তাঁর মা আযরকে জানান যে, ইবরাহীম তারপুত্র। এরপর সমস্ত ঘটনা তাকে অবহিত করেন। এতে আযর অত্যন্ত আনন্দিত হন। (আত-তাবারী, খঃ১, পৃ. ১২০) ইবরাহীম আ. এর পিতা আযর ছিল কাঠমিস্ত্রী। সে কাঠের মূর্তি তৈরী করতো এবং মূর্তি-পুজকদের নিকট তা বিক্রয় করতো। (আল-নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃঃ ৭৯), ইবরাহীম আ.-এর মাতার নাম ছিল উমায়লা। আল-কালবীর বর্ণনা মতে, তার নাম ছিল বূনা বিনত কারবানা ইব্‌ন কারছী আরকাখশাখ ইবন সাম ইবন নূহ আ. এর বংশধর। (ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খঃ ১, পৃ. ১৪০)।

ইবরাহীম আ. এর হেদায়াত প্রাপ্তি

হযরত ইবরাহীম আ. বাবিলে জন্মগ্রহন করে যৌবনে পদার্পন করে দেখতে পান, সেদেশের তখনকার শাসক নমরূদ। সে-ই প্রথম স্বেচ্ছাচারী ও কঠোর আচরণকারী রাজা ছিল। সে বিভিন্ন ধরনের ইসলাম বিরোধী আদর্শের প্রচলন করে। রাজার মাথার মুকুট ধারণ, শয়তানের প্ররোচনায় জ্যোতির্বিদার প্রসার এবং তারকার প্রতি দৃষ্টিপাত করে ভূত ভবিষ্যৎ গণণার প্রচলন করে। (ইবন কুতায়বা আল-আরিফ পৃ. ৩) নমরূদ ই প্রথম লোকজনকে তার পূজা করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং নিজকে ক্ষমতাধর বিধাতা বলে দাবি করে, আল্লাহর অবাধ্যতা ও বিরোধিতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। তার সময়ই অগ্নি পূজার প্রচলন হয় এবং জ্যোতির্বিদ্যার উদ্ভব ঘটে। (আল-মাসউদী, মুরূজুয়-যাহাব, খ. -১, পৃ. ৪৪)।

উল্লেখিত পরিবেশে হযরত ইবরাহীম আ. যৌবনে পদার্পন করেন ও এই বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তার সন্ধান করতে থাকেন। তার নিকট স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তার জাতি যে মূর্তিগুলো পূজা করছে তাতো মানুষেরই তৈরী, সুতরাং শক্তি ক্ষমতাহীন কোন কিছু ইলাহ হতে পারে না। এ ধরনের চিন্তার মাঝে আল্লাহ ইবরাহীম আ.-কে সৃষ্টিকর্তার সন্ধান দেন। আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً اِنِّىْ اَرٰكَ وَقَوْمَكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ. وَكَذٰلِكَ نُرِىْ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا قَالَ هٰذَا رَبِّىْ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لاَ اُحِبُّ الاٰفِلِيْنَ. فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّىْ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِىْ رَبِّىْ لاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ. فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ. اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. وَحَاۤجَّه قَوْمُه قَالَ اَتُحَاۤجُّوْنِّىْ فِى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰنِ وَلاَ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِه اِلاَّ اَنْ يَّشَاۤءَ رَبِّىْ شَيْئًا وَسِعَ رَبِّىْ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا اَفَلاَ تَتَذَكَّرُوْنَ. وَكَيْفَ اَخَافُ مَاۤ اَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِه عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا فَاَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالاَمْنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

'স্মরণ কর, ইবরাহীম তাঁর পিতা আযরকে বলেছিল, আপনি কি মূর্তিকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করেন? আমি তো আপনাকে ও আপনার সাম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমগ্ন দেখছি। এভাবে আমি ইবরাহীমকে আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালনা ব্যবস্থা দেখাই, যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। অতঃপর রাত্রির অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করলো তখন সে নক্ষত্র দেখে বললো, এই আমার প্রতিপালক। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হলো তখন সে বললো, যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করিনা। অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে সমুজ্জ্বল রূপে উদিত হতে দেখলো তখন বললো, এই আমার প্রতিপালক। যখন তাও অস্তমিত হলো তখন সে বললো, আমাকে আমার প্রতিপালনক সৎপথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পতভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হবো। অতঃপর যখন সে সূর্যকে দীপ্তিমান রূপে উদিত হতে দেখলো তখন বললো, এই আমার প্রতিপালক, এটিই সর্ববহৃৎ। যখন তাও

অস্তমিত হলো তখন সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়। তোমরা যাকে আল্লাহর শরীক কর তার সাথে আমার কোন সংশ্রব নেই। আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। তাঁর সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো। সে বললো, তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে? তিনিতো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। আমার প্রতিপালনক অন্যবিধ ইচ্ছা না করলে তোমরা যাকে তার সাথে শরীক কর তাকে আমি ভয় করি না। সব কিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত, তবে কি তোমরা অনুধাবন করবেনা? তোমরা যাকে আল্লাহর শরীক করো আমি তাকে কিরূপে ভয় করবো? অথচ তোমরা আল্লাহর শরীক করতে ভয় কর না, যে বিষয়ে তিনি তোমাদের কোন সনদ দেননি। সুতরাং তোমরা যদি জানো তবে বলো, দু'দলের মধ্যে কোন দল নিরাপত্তা লাভের বেশী হক দার। (সূরা আল-আনয়াম ঃ ৭৪-৮১)।

এভাবেই হযরত ইবরাহীম আ. তার দেশের রাজা নমরূদকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান গ্রহণের আহবান জানালে তাদের মাঝে যুক্তি তর্কের অবতারনা হয়, অবশেষে আল্লাহর দুশমন পরাজিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَاجَّ اِبْرَاهِيْمَ فِىْ رَبِّه اَنْ اتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ، قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَامِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.

তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখনি, যে ইবরাহীমের সাথে তার প্রতি পালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল যেহেতু আল্লাহ তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছলেন। যখন ইবরাহীম বললেন, তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। সে (নমরূদ) তখন বললো, আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। ইবরাহীম বললেন, আমার প্রভূ সূর্যকে পূর্ব দিক হতে উদয় করান, তুমি তা পশ্চিম দিক হতে উদয় করাও তো? একথায় আল্লাহর দুশমন হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (সূরা আল-বাকারা ৎ ২৫৮)। অতঃপর ইবরাহীম আ. তাঁর পিতাকে ও তার সম্প্রদায় কে কুফরী ও শিরক থেকে বিরত রাখার জন্য যুক্তি তর্কের মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّه كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا. اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَالَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِىْ عَنْكَ شَيْئًا. يٰاَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَاءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِىْ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يٰاَبَتِ لَاتَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا. يٰاَبَتِ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا. قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِىْ يٰاِبْرٰهِيْمُ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًّا. قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُلَكَ رَبِّىْ اِنَّهُ كَانَ بِىْ حَفِيًّا. وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْارَبِّىْ عَسٰى اَلَا اَكُوْنَ بِدُعَاءِ رَبِّىْ شَقِيًّا.فَلَمَّا اعْتَزَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَه اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. وَ وَهَبْنَالَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا.

'স্মরণ কর, এই কিতাবে উল্লেখিত ইবরাহীমের কথা; তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ, নবী। যখন তিনি তাঁর পিতাকে বললেন হে আমার পিতা! আপনি তার ইবাদত কেন করেন যে শুনে না দেখে না এবং আপনার কোন কাজেই আসে না? হে আমার পিতা আমার নিকট তো এমন জ্ঞান এসেছে যা আপনার নিকট আসেনি, সুতরাং আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাবো। হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত করবেন না। শয়তান তো দয়াময় আল্লাহর অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমি তো আশংকা করি, আপনাকে দয়াময় আল্লাহর শাস্তি স্পর্শ করবে, তখন আপনি শয়তানের বন্ধু হয়ে পড়বেন। পিতা বললেন, হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী হতে বিমুখ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাননাশ করবই; তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট হতে দূর হয়ে যাও। ইবরাহীম বললেন, আপনার প্রতি সালাম। আমি আমার প্রতি পালকের নিকট আপনর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো, নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। আমি আপনাদের ও আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদত করেন তাদের থেকে পৃথক হচ্ছি। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট দোয়া করি; আশা করি তাঁর নিকট দোয়া করে আমি ব্যর্থ হবো না। অতঃপর তিনি যখন তাদের ও তারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদত করতো সে সকল হতে পৃথক হয়ে গেলেন তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে নবী করলাম। তাদেরকে আমার অনুগ্রহ দান করলাম ও তাদের নাম যশ-সমুচ্চ করলাম।' (সূরা মারয়াম ঃ ৪১-৫০)।

উল্লেখিত আয়াত সমূহে হযরত ইবরাহীম আ. তাঁর পিতাকে মহান আল্লাহর দেয়া নবুওয়াত ও সত্য হিদায়েতের প্রতি দাওয়াত দান করেন। কিন্তু মহান আল্লাহর দীন ও বিধি বিধানকে মেনে নিতে অস্বীাকর কারীগণ নবীকে তার দাওয়াত থেকে বিরত থাকতে অথবা তাকে হত্যার হুমকী দিল। তবুও ইবরাহীম আ. তার পিতার জন্য মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করার ঘোষণা দেন। অতঃপর আল্লাহর নবী ইবরাহীম আ. নিজের জীবন বিপন্ন করে ও মানবতা কে পথভ্রষ্ট ও ধ্বংসকারী মূর্তিগুলোকে নিজ হাতে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে প্রমাণ করে দেখালেন যে, যারা তাদের মিথ্যা খোদার দাবীদার মনে করে তারা কত অন্যায় পথে চলছে। তা থেকে ফিরে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবানকারী হিসেবে তিনি নিজে আল্লাহর কত অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়েছেন এবং আল্লাহর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। এসব বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা হলো ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ. اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاهٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ. قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَاءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ. قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَ اٰبَاؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ. قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ. قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ وَ اَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ. وَ تَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ. فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ. قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ. قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ. قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ. قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ. قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ. فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ. ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَاءِ يَنْطِقُوْنَ. قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَضُرُّكُمْ. اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ. قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَ انْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ. قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا

وَّسَلْمًا عَلَى اِبْرٰهِيْمَ. وَ اَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الاَخْسَرِيْنَ. وَ نَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ. وَ وَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً وَ كُلاًّ جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ. وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَ اَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَ اِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءَ الزَّكٰوةِ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ.

'আমি তো এর পূর্বে ইবরাহীমকে সৎপথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত। যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বললো, এই মূর্তিগুলো কি? যাদের পূজায় তোমরা রত আছ? তারা বললো, আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষগণকে এদের পূজা করতে দেখেছি। সে বললো, তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পিতৃ পুরুষগণও রয়েছে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে। তারা বললো, তুমি কি আমাদের নিকট সত্য তথ্য নিয়ে এসেছো? না তুমি কৌতুক করছো ? সে বললো, না, তোমাদের প্রতিপালক তো আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং এ বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী। শপথ আল্লাহর। তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্বন্ধে অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করবো। অতঃপর সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল মূর্তিগুলোকে, তাদের প্রধানটি ব্যতীত; যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে। তারা বললো, আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি এরূপ করলো কে? সে নিশ্চয় সীমা লংঘনকারী। কেউ কেউ বললো, এক যুবককে মূর্তিগুলোর সমালোচনা করতে শুনেছি, তাকে ইবরাহীম বলে ডাকা হয়। তারা বললো, তাকে উপস্থিত করো লোক সম্মুখে, যাতে তারা সাক্ষ্য দিতে পারে। তারা বললো হে ইবরাহীম, তুমিই কি আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি এরূপ করেছো? সে বললো, সেই তো এটা করেছে? সেই তো এদের প্রধান। এদেরকে জিজ্ঞাসা কর, যদি তারা কথা বলতে পারে। তখন তারা মনে মনে চিন্তা করে দেখলো এবং একে অপরকে বলতে লাগলো, তোমরাই তো সীমালংঘনকারী! অতঃপর তাদের মাথা অবনত হয়ে গেল এবং তারা বললো, তুমিতো ভালো জানো যে, এরা কথা বলে না। ইবরাহীম বললো, তবে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না ক্ষতিও করতে পারে না? ধিক তোমাদেরকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত করো তাদেরকে! তবে কি তোমরা বুঝবে না? তারা রায় ঘোষণা করলো যে, তাকে পুড়িয়ে দাও, এবং সাহায্য কর তোমাদের দেবতাগুলোকে, তোমরা যদি কিছু করতে চাও। আমি বললাম, হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। তারা

তার ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করেছিল কিন্তু আমি তাদেরকে করেছিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। এবং আমি তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলাম সেই দেশে যেথায় আমি কল্যাণ রেখেছি বিশ্ববাসীর জন্য এবং আমি ইবরাহীমকে দান করেছিলাম ইসহাক এবং পৌত্ররূপে ইয়াকুব; আর প্রত্যেককেই করেছিলাম সৎ কর্মপরায়ণ এবং তাদেরকে করেছিলাম নেতা। তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথপ্রদর্শন করতো; তাদেরকে ওহী প্রেরণ করেছিলাম সৎকর্ম করতে, সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে; তারা আমারই ইবাদত করতো।" (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৫১-৭৩)।

এখানে ইবরাহীম আ. তার মূর্তি পূজারী জাতিকে তাদের মিথ্যা প্রভুদের পূজার অসারতা প্রমাণ করার জন্য সুযোগ মতো সকল ছোট খাট মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে বড়টাকে অক্ষত রেখে দিলেন। পরে তাদের প্রশ্নের জবাব বড় মূর্তির থেকে নেয়ার জন্য বললেন। তারা যখন বললো যে তুমি তো জানো যে মূর্তি কথা বলতে পারে না। তখন তাদের মিথ্যা দেবতা পূজার অসারতা প্রমাণ করে বলেন যে, নিজে কথা বলতে পারে না, কারো কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না, নিজকে রক্ষা করতে পারে না সে উপাস্য হতে পারে না। এমনিভাবে পূর্ণ তাওয়াক্কুলের সাথে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে সত্যের উপর অনড় ও অটল থেকে দীনের দাওয়াতী কাজে নিজেকে লিপ্ত রাখার কারণে জ্বলন্ত ও আযাবপূর্ণ অগ্নি গহব্বর আল্লাহর নির্দেশে শিতল নিরাপদ হয়ে যায়। এমনিভাবে সত্যের উপর অটল থেকে দীনের দাওয়াত চালাতে থাকলে মহান আল্লাহর সাহায্য সরাসরি পাওয়া যায়।

হযরত ইবরাহীম হিজরত করে বায়তুল মাকদাসের নিকটে অবস্থান করেন। বিশ বছর পর তাঁর বন্ধা স্ত্রী সারা তাঁর খাদেমা হাজারকে সন্তান লাভের আশায় ইবরাহীম আ.-এর সাথে বিয়ে দেন। ইবরাহীম আ.-এর ৮৬ বৎসর বয়সে ইসমাঈল আ. নামক পুত্র সন্তানের পিতা হন। এর ১৩ বছর পর দ্বিতীয় পুত্র ইসহাক আ. জন্ম গ্রহণ করেন। (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায় ওয়া-নিহায়া-খ-১, পৃ. ১৫৩)।

অতঃপর ইসমাঈল আ. যখন নিজের কাজসমূহ নিজেই আঞ্জাম দিতে সক্ষম হলেন, তখন ইবরাহীম আ.-কে স্বপ্নে দেখানো হলো ইসমাঈলকে যবেহ করতে।

এটা ছিল ইবরাহীম আ.-এর জন্য এক বিরাট ও কঠিন পরীক্ষা। বার্ধক্যে প্রাপ্ত অতি কামনার ধন স্নেহ ও আদরের দুলালকে একবার তো জনমানবহীন মরু প্রান্তরে নির্বাসন দিতে হয়েছে। তাতেও সান্ত্বনা ছিল যে, মাঝে মধ্যে তাকে দেখে যেতে পারতেন। কিন্তু এবার একেবারে যবেহ করার নির্দেশ তাও আবার স্বহস্তে, কিন্তু এই পরীক্ষায়ও তিনি সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হন। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। এবং স্বীয় পুত্রের নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করলেন যাতে প্রফুল্ল

চিত্তে সে রাযী হয়ে যায় এবং জোর যবরদস্তি করতে না হয়। এ কথা পবিত্র কুরআনের ভাষ্য মতে এরূপ ঃ

'অতঃপর আমি তাকে (ইবরাহীমকে) এক স্থিরবুদ্ধি সম্পন্ন পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। অতঃপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ করবার মত বয়সে উপনীত হলো তখন ইবরাহীম বললো বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি তোমাকে যবাহ্ করছি। এখন তোমার অভিমত কি বল।" ইসমাঈল বললো, হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা-ই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।" (সূরা-আস-সাফ্ফাত ঃ ১০১-১০২)

মহান আনুগত্যশীল ইবরাহীম যেমনি তার রবের নির্দেশ পালনের জন্য বৃদ্ধকালীন একমাত্র পুত্রকে স্বহস্তে যবাহ্ করতে প্রস্তুত হলেন তেমনি মহান ধৈর্যশীল ইসমাঈল ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নির্দ্বিধায় ও স্বউৎসাহে নিজ জীবন কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে তাঁর হুকুম আহকাম ও বিধি বিধান পালন করে জীবন অতিবাহিত করার যে নির্দেশ দিয়েছেন তা কার্যকরী করার জন্য যে ত্যাগ ও কুরবানীর প্রয়োজন, আর শয়তান ও তার অনুসারীদের চরম বাধার মুখে যে বজ্র কঠিন মনোবল নিয়ে একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহ্র হুকুম পালন করতে হয় তার জন্যই সামর্থবান মানুষদের কে প্রতি বছর একবার পশু কুরবানীর দ্বারা তার প্রমাণ পেশ করতে হয় যার প্রচলন শুরু হয়েছিল ইবরাহীম আ. কর্তৃক আল্লাহর জন্য কুরবানী পেশের মাধ্যমে।

ইবরাহীম আ. কর্তৃক কা'বা ঘর নির্মাণ ও হজ্জের আহ্বান

হযরত ইবরাহীম আ. বেশ কিছুকাল পরে পুনরায় মক্কায় আগমন করেন। ইসমাঈল তখন যমযমের নিকটেই একটি গাছের নিচে তীর ঠিক করছিলেন। পিতাকে দেখেই তিনি তাঁর নিকট গেলেন ও সাক্ষাৎ করলেন। অতঃপর ইবরাহীম আ. বললেন, ইসমাঈল! আল্লাহ্ আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল বললেন, আপনার প্রতিপালক আপনাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করুন। ইবরাহীম আ. বললেন তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে? ইসমাঈল বললেন অবশ্যই আমি আপনাকে সাহায্য করবো। (তাবারী, তারীখ, খ. ১, পৃ. ১৩৩)।

ইব্ন আব্বাস রা. বলেন, ঐ সময়ে পিতা ও পুত্র উভয়ে মিলে বায়তুল্লাহর ভিত্তি স্থাপন করেন। ইসমাঈল পাথর সংগ্রহ করে দিচ্ছিলেন ও ইবরাহীম আ. তা দ্বারা ভিত তৈরি করছিলেন। এভাবে ভিত উঁচু হয়ে গেলে ইসমাঈল মাকামে ইবরাহীম নামক পাথরটি নিয়ে এলে ইবরাহীম আ. তার উপর দাড়িয়ে বায়তুল্লাহ্ নির্মাণ

করছিলেন। আর ইসমাঈল পাথর এনে দিচ্ছিলেন, এ সময় উভয়ে আল্লাহ্ নিকট দোয়া করছিলেন এই বলে ঃ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

"হে আমাদের রব, আমাদের এ কাজ গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১২৭)
সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া খ.-৪, পৃ. ৬০২)।
এই কা'বা গৃহই আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্মিত বিশ্বের সর্বপ্রথম মসজিদ। আল্লাহ একে বরকতময় ও বিশ্ববাসীর জন্য সৎ পথের দিশারী বলে ঘোষণা করছেন। এখানে যেই প্রবেশ করুক না কেন আল্লাহ্ তার নিরাপত্তার ঘোষণা দিয়েছেন। এবং সেখানে যাওয়ার সামর্থ্যবানদের জন্য এই মসজিদকে কেন্দ্র করে হজ্জ সম্পন্ন করা ফরয করে দিয়েছেন। যেখানে দুনিয়ার সকল এলাকা থেকে সামর্থ্যবান মানুষ কিয়ামত পর্যন্ত প্রতি বছরে কমপক্ষে একবার একত্রিত হয়ে বিশ্ব সম্মেলনে শরীক হয়।
পবিত্র কা'বা ঘর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীমকে আ. হজ্জের আহ্বান জানানোর নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالاً وَّ عَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ. لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَارَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الاَنْعَامِ. فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوْا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ.

"আর মানুষের নিকট হজ্জের জন্য আহ্বান জানাও। তারা তোমার নিকট আসবে পদ ব্রজে ও সর্ব প্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রসমূহের পিঠে, এরা আসবে দূর-দূরান্ত পথ অতিক্রম করে যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিযক হিসেবে দান করেছেন-তার উপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে। অতঃপর তোমরা তা হতে আহার কর এবং দুস্থ ও অভাবগ্রস্তকে আহার করাও।" (সূরা আল-হাজ্জ ২৭-২৮)।
আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়ে আরও ঘোষণা করে বলেন ঃ

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ. فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَه كَانَ اٰمِنًا وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً .

"মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায়; তা বরকতময় ও বিশ্ববাসীর জন্য সৎপথের হিদায়েতের দিশারী। তাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন মাকামে ইবরাহীম এবং যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৬-৯৭)

এই কা'বা ঘরকে আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির মিলন কেন্দ্র ও নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে তৈরী করেছেন। এখানে অবস্থিত মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান বানাবার নির্দেশ দিয়েছেন এর তাওয়াফকারী ই'তেকাফকারী ও রুকু এবং সিজদাকারীর জন্য।

তাই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ.

"এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন কা'বা গৃহকে মানব জাতির মিলন কেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম, তোমরা ইবরাহীমের দাড়াবার স্থানকেই সালাতের স্থান রূপে গ্রহণ কর এবং ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে তাওয়াককারী, ই'তেকাফকারী, রুকু' ও সিজদাকারীদের জন্য আমার গৃহকে পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১২৫)।

এখানে আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন দুনিয়ায় মানব জাতিকে তাঁর হুকুম আহকাম মেনে চলে পরম শান্তির সমাজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য যে শিক্ষা প্রশিক্ষণ দরকার তার জন্য নিরাপত্তাপূর্ণ মিলন কেন্দ্র স্বরূপ কা'বা ঘরকে পবিত্র করার ব্যবস্থা করেছেন।

অতঃপর ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ. নিজেদের হজ্জ সমাপনের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেয়ার জন্য দো'আ করেন ও ভুলত্রুটি হতে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেন ঃ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার এক অনুগত উম্মত তৈরি কর। আমাদেরকে

ইবাদতের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আল-বাকারা ঃ ১২৮)
তাঁরা আরও দোয়া করেছিলেন এই বলে যে,

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ ايتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

"হে আমাদের বর! তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট এমন এক রসূল প্রেরণ করো যিনি তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তেলাওয়াত করবে তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা বাকারা ঃ ১২৯)
মহান আল্লাহ ইবরাহীম ও ইসমাঈলের উল্লেখিত দোয়া কবুল করেছিলেন। অতঃপর ইসমাঈল আ.-এর বংশে প্রেরণ করেন সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। এ জন্যই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি আল্লাহর নিকট রক্ষিত উম্মুল কিতাবে 'খাতামুন নাবিয়্যীন' হিসেবেই লিপিবদ্ধ ছিলাম। আর তখন আদম আ.-এর রূহ দেহে প্রবেশ করেনি। অতি সত্ত্বর আমি তোমাদেরকে এর ব্যাখ্যা দিব। আমি হলাম আমার আদি পিতা ইবরাহীমের দোয়া এবং ঈসা আ.-এর সুসংবাদ।" (আমহদ, আল-মুসনাদ, খ. ৪, পৃ. ১২৭-১২৮)।
এভাবেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর খলিলকে দুনিয়ার মানুষের হেদায়াতের জন্য একটি উম্মত গড়ার শিক্ষক ও মুসলিম জাতির আদি পিতা করে সৃষ্টি করেন। তাঁকে দীনের ইবাদত শিক্ষা দেন ও শিক্ষক হিসেবে তৈরি করে ইতিহাসে অমর হয়ে রাখেন।
মহান আল্লাহ মানব জাতিকে তারই বিধান মোতাবেক জীবনের সকল কিছু কার্যকর করা ও রাখার জন্যই যুগেযুগে অসংখ্য নবী ও রসূল প্রেরণ করেছেন। যার জন্য সর্বদা সংগ্রাম সাধনা চালিয়েছেন হযরত আদম, হযরত শীছ, হযরত ইদরীস আর আপসহীন ভাবে জাতির সার্বিক জীবনে আল্লাহর বিধান কায়েমের সাধনা চালিয়েছেন হযরত নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সবার জীবন যাপন ও দাওয়াতী ব্যবস্থা ছিল একই আর তাহলো ইসলাম। আর সকলের দায়িত্ব ছিল একই। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّى بِه نُوْحًا وَّالَّذِىْ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِه اِبْرهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَ لاَ تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ.

"তিনিই তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে, আর যা আমি ওহী করেছি তোমাকে, আর যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর। এবং তাতে মতভেদ করেন না।" (সূরা আশ শূরা ঃ ১৩)।

মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান ও আইন-কানুন মোতাবেক বিচার ফয়সালা করার নামই হলো "ইকামতে দীন"। আর এই দায়িত্ব পালনের জন্য সকল নবী ও রসূলের জীবনেই এই সংগ্রাম সাধনা পরিচালিত হয়েছে। হযরত নূহ আ. যেমনি তাঁর জাতির লোকদের প্রতি সূদীর্ঘ সাড়ে নয় শত বছর এ দীন কার্যকরী করার দায়িত্ব পালন করেছেন। তেমনি হযরত ইবরাহীম আ. ও এ দায়িত্ব পালনের জন্য তৎকালীন বাদশাহ নমরূদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছেন। পিতাসহ জাতির লোকদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন। অত্যাচার সহ্য করেছেন যুক্তিতর্ক করেছেন, হিজরত করেছেন, আল্লাহর নিকট কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। বায়তুল্লাহ নির্মাণ করে দুনিয়ার মানুষকে দীন কায়েমের শিক্ষার কেন্দ্র স্থলে ও হজ্জের আহ্বান জানিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

হযরত লূত আ.

হযরত ইবরাহীম আ. নবুওয়াত লাভের পর তাঁর পৌত্তলিক জাতির সাথে বিশ্বাস ও আদর্শগত বিরোধের কারণে তাঁর জন্ম ভূমি (فَدَّانُ اَرَام) (আরাইস পৃ. ৭৯) হতে কালদীয় শূলাকার উর (اُوْر) নামক শহরে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। এ শহরটি দক্ষিণ ইরাকে ফুরাত নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল। হযরত লূত আ. হযরত ইবরাহীম আ.-এর সহোদর 'হারান'-এর পুত্র ছিলেন। তিনি 'উর' নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর দুর্ভিক্ষের কারণে সেখান থেকে স্থানান্তরিত হলে হারান নামক স্থানে আসেন। সেখানে লূত এর পিতা হারান তার পিতা আযারের জীবদ্দশায় ইনতিকাল করেন। ফলে শৈশব হতেই তিনি নিঃসন্তান পিতৃব্য হযরত ইবরাহীম আ.-এর গৃহে লালিত পালিত হন। তিনি ছিলেন পিতৃব্যের একান্ত স্নেহ ভাজন। বিভিন্ন এলাকায় হিজরতের সময় ঐ সকল সফরে হযরত ইবরাহীম আ.-এর সাথে ভ্রাতুষ্পুত্র লূত আ. ও তার সাথে ছিলেন। (বিদায়া, খ. ১, পৃ. ১৫০)।

এলাকার কাফের ও মুশরিকদের অত্যাচারের কারণেই ইবরাহীম আ. বারবার আবাসিক এলাকা পরিবর্তন করেন। এই দেশ ত্যাগের সময় তাঁর সাথে লূত আ. ও ছিলেন এবং তিনিও দুশমনদের হামলা থেকে রক্ষা পান। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ.

“আমি তাঁকে (ইবরাহীমকে) ও লূতকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলাম সেই দেশে যেখানে আমি বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণ রেখেছি।” (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৭১)
হযরত উরাই ইব্‌ন কায়া'ব রা., আবূল আলিয়া, কাতাদা র. প্রমুখের মতে উক্ত আয়াতে হযরত ইবরাহীম ও লূতের সিরিয়া গমনকে বুঝানো হয়েছে এবং ইব্‌ন আব্বাস রা.-এর মতে মক্কায় গমনকে বুঝানো হয়েছে। (বিদায়া, খ. ১ পৃ. ১৫০, তাফসীরে কাসীর, খ. ২২, পৃ. ১৯০)। তবে রুহুল মা'আনীতে মিসরের কথাও উল্লেখিত হয়েছে। অবশ্য সিরিয়া সম্পর্কিত মতকে সহীহ বলা হয়েছে। (রুহুল মা'আনী খ. ১৭, পৃ. ৭০)।
আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠারও কাজের কারণে পৃথিবীতে হযরত ইবরাহীম আ.-ই সর্বপ্রথম দেশত্যাগ করেন এবং তাঁর সাথে স্ত্রী ও ভ্রাতুস্পুত্র লূতও ছিলেন।
এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইবরাহীম আ. তার স্ত্রী সারাসহ হিজরতের সময় লূত আ. এর স্ত্রী ও তার সাথে ছিলেন অতঃপর চাচা ও ভ্রাতুষ্পুত্র সিরিয়ায় পৌঁছে কিন আনীদের এলাকায় সিক্কীম (নাবলুস) এ অবস্থান করেন। (নাজ্জার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪) পরে ঐ এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তাঁরা সেখান থেকে মিসরে হিজরত করেন।
হিজরতের মাঝে বিভিন্ন বিপদাপদের পর তারা প্রচুর মাল-সম্পদের অধিকারী হন। শেষে উক্ত ধন-সম্পদ সহ পুনরায় পবিত্র ভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন। (বিদায়া খ. ১ পৃ. ১৫২)। এই প্রত্যাবর্তনের পথে হযরত লূত আ. পিতৃব্যের সম্মতিক্রমে ‘সাদুম’ এলাকায় বসতি স্থাপন করেন এবং এই ভ্রমণের এক পর্যায়ে নবুওয়াত লাভ করেন। (আবদুল ওয়াহহাব আন-নাজ্জার কাসাসুল আম্বিয়া, দারুল ফিক্‌র বৈরূত, পৃ. ৯০-৯১)।
হাকেম নীশাপুরীর মতে হযরত লূত আ. মিসর হতে সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তনের পথে নবুওয়াত লাভ করেন। (আলযুগ তাররাক খ. ২, পৃ. ৫৬২)। পবিত্র কুরআনে সূরা আল আনয়ামের ৮৪-৮৬ নং আয়াতে উল্লেখিত ১৮ জন নবীর তালিকায় তিনিও অন্তর্ভুক্ত ঃ উক্ত আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

وَاِسْمَاعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا.

“ইসমাঈল, আল-ইয়াসা'আ, ইউনুস ও লূত, (সূরা আল-আন'আম ৮৬)।

[illegible] দাওয়াত ও প্রতিষ্ঠার তৎপরতা

হযরত লূত আ. শিশুকাল থেকেই পিতৃব্য হযরত ইবরাহীম আ.-এর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হওয়ায় তাঁর চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা যাঁদেরকে নবুওয়াত ও রিসালাতের পদে অভিষিক্ত করেছেন তাঁদের জন্মবিধি

তাদেরকে শিরক সহ সকল প্রকারের পংকিলতা হতে মুক্ত ও পবিত্র রেখেছেন। সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষকে তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি ঈমান আনা ও তা তাঁদের জীবনে বাস্তবায়িত করা এবং সে অনুযায়ী সমাজের সকল ব্যাপারে বিচার ফয়সালা করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনা করে থাকেন। তাদের জীবনের মূল লক্ষ ও দায়িত্বই হলো আল্লাহর দীনের ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করা। এ ব্যাপারে মতবিরোধ না করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ রয়েছে। পবিত্র কুরআনে হযরত লূত আ. এর কার্যক্রম সম্পর্কে ও অনেক আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন হযরত লূত আ. আজকের (Dead Sea) মৃত সাগর স্থানে 'সাদুম' নামক এলাকাবাসীর নিকট তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেন ও তাদেরকে চরিত্রের পবিত্র তা অর্জনের ও অপকর্ম থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। তারা তাঁকে অবিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যান করলে তিনি বলেন, (وانّى لَكُمْ رَسُوْلٌ أمِيْنٌ) (সূরা আশ-শূ'আরা ঃ ১৬২)। 'আমি তোমার প্রতি একজন বিশ্বস্ত রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।' সুতরাং তোমরা তোমাদের মুক্তির জন্যই আমার দাওয়াত গ্রহণকর ও মেনে নাও। আমাকে অস্বীকার ও অমান্য করলে তোমাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে ধ্বংসাত্মক আযাব নেমেই আসবে।

হযরত লূত আ. তার জাতিকে সর্বাত্মকভাবে সতর্ক করেন, তাদেরকে সৎপথে নিয়ে আসার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর আনুগত্য ও পাপাচার ত্যাগ করে পবিত্র জীবন যাপন করার আহ্বান জানান। তিনি যুক্তি দেন যে তিনি তো তাদের নিকট কোন বিনিময় চাচ্ছেন না, সুতরাং এই নিঃস্বার্থ দাওয়াত তাদের জন্যই কল্যাণকর। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلاَتَتَّقُوْنَ. اِنّى لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ. وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

'যখন তাদের ভ্রাতা লূত তাদেরকে বললো, তোমরা কি সাবধান হবে না। আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয়কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো পুরস্কার স্বরূপ জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই আছে।" (সূরা আশ-শূ'আরা ঃ ১৬১-১৬৫)। অর্থাৎ তিনি তাঁর জাতিকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন যে, তিনি তাদের নিকট আল্লাহর বাণী পৌছে দিচ্ছেন এবং তাদের কুকর্মের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করছেন। যাতে তারা আল্লাহর আযাবকে ভয় করে এবং সৎপথ অবলম্বন করে।

তিনি আরও বলেন যে, এমনিভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানানোর সর্বাত্মক চেষ্টাসাধনা করার পিছনে তাঁর কোন পার্থিব স্বার্থ নেই, দুনিয়ায় সুনাম-সুখ্যাতি অর্জও উদ্দেশ্য নয়, তাদের নিকট তিনি কোনরূপ পার্থিব স্বার্থও দাবি করেন না, তাঁর পুরস্কার তো তিনি আল্লাহর নিকটই আশা করেন। তাঁর উপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণী তাদের নিকট পৌছাবার যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তিনি সেই দায়িত্বই পালন করছেন। এরূপ নিঃস্বার্থ লোক সম্পর্কে তাদের বুঝা উচিত যে, তিনি কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না, তিনি যা বলছেন তা তাদের কল্যাণের জন্যই বিশ্বস্ততার সাথেই বলছেন।

কিন্তু তারা তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিল না। তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনলো না, তারা শুধু পাপাচারেই নিবৃত্ত হয়নি বরং উদ্ধত মস্তকে আরও বেপরোয়া হয়ে ঘৃণ্য ও কদর্যতায় লিপ্ত হলো। তাদের নিকট প্রশংসনীয় কাজ দুর্নামের বিষয় এবং দুষ্কর্ম প্রশংসনীয় বিষয় হয়ে দাড়ালো। তারা আল্লাহর নবীকে অমান্য তো করলোই, তাঁকে দেশ হতে উৎখাতের হুমকী দিল এবং তিনি সত্যবাদী হয়ে থাকলে তাদের উপর প্রতিশ্রুত শাস্তি আনয়নের আহ্বান জানালো। (বিদায়া, খ. ১, পৃ. ১৭৮)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ (كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ الْمُرْسَلِيْنَ)

"লূতের সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করলো" (সূরা আশ-শূ'আরা ঃ ১৬০)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, (وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ) তিনি (লূত) এদেরকে আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন, কিন্তু তারা সতর্ককারী সম্বন্ধে বিতর্ক করলো (সূরা আল-ক্বামার ঃ ৩৬)। অতঃপর লূত আ. যখন দেখলেন যে, সর্বাত্মক দাওয়াতী তৎপরতার পরেও তারা তাদের দুঃষ্কর্ম পরিত্যাগ করছে না তখন তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বলেন ঃ (قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِيْنَ) তিনি (লূত) বললেন, আমি তোমাদের এসব কর্মকে ঘৃণা করি। (সূরা আশ-শূ'আরা ঃ ১৬৮)

হযরত লূত এর জাতি তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হলো না বরং তারা তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শনকারী নবীকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়ার হুমকী দিল এ সম্পর্কে আল্লাহ সংবাদ জানিয়ে বলেন ঃ

قَالُوْا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ.

"তারা বললো হে লূত! তুমি যদি (তোমার দাওয়াতী কাজ ও আমাদের কার্যাবলীর সমালোচনা থেকে) নিবৃত্ত না হও তবে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হবে। (সূরা আশ-শূ'আরা ঃ ১৬৭)।

অবশেষে 'সাদুম'বাসী নবীর দাওয়াত অস্বীকার করলো, দাওয়াত থেকে নিবৃত্ত করতে না পেরে তারা নবীকে দেশ থেকে বহিষ্কার করার ব্যবস্থা করলো, আল্লাহ্ এ সংবাদ দিয়ে বলেন ঃ

اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ.

"তোমরা এদেরকে তোমাদের জনপদ হতে উচ্ছেদ কর, এরা তো এমন লোক পূর্ণাঙ্গভাবে পবিত্র থাকতে চায়" (সূরা আ'রাফ ঃ ৮২)।

হযরত লূত আ.-ও তার মুষ্টিমেয় অনুসারী পবিত্র হতে ও পবিত্র থাকতে চায় বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় তাফসীর কারগণ বলেছেন যে, "সাদুম" জাতি (তাদের যৌন ক্ষুধা নিবারণের জন্য মহিলাদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষে পুরুষে যে সমকামিতার নোংরা কাজে অভ্যস্ত ছিল) তারা সেই সমকামিতা হতে পবিত্র থাকতেন (তাফসীরে ইবন 'আব্বাস, পৃ. ১৩২; তাফসীর তাবারী, খ. ১২, পৃ. ৫৫০; তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর, বাংলা অনু., খ. ৪, পৃ. ২৬৩)। কাতাদা র. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, উক্ত কথা দ্বারা তারা ব্যঙ্গচ্ছলে নির্দোষীকে দোষী পাপাচারের সমালোচনাকারীকে দোষী সাব্যস্ত করলো।

এ থেকে জানা যায় যে, লূত সম্প্রদায় কেবল নির্লজ্জ, নৈতিকতাবর্জিত ও চরিত্রহীন-ই ছিল না, বরং নৈতিক অধঃপতনে তারা এত নিম্নস্তরে নেমে গিয়েছিল যে, তারা নিজেদের মধ্যে কয়েকজন নেক চরিত্রের লোক, কল্যাণের দিকে আহ্বানকারী এবং অন্যায় ও পাপাচারের সমালোচনাকারী লোকের অস্তিত্বকে পর্যন্ত বরদাশত করতে প্রস্তুত ছিল না। তারা পাপে এতদূর মগ্ন হয়ে পড়েছিল যে, সংশোধনের কোন প্রচেষ্টাকেই তারা সহ্য করতে পারতো না।

হযরত লূত আ. বুঝতে পারলেন যে, "সাদুমের" এই পাপাচারী জাতি আল্লাহর নাফরমানীর কারণে আল্লাহর ধ্বংসাত্মক আযাবে আপতিত হবেই। কারণ তারা নবীর দাওয়াত তো গ্রহণ করেইনি বরং তারা সৎপথ প্রদর্শক আল্লাহর নবীকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তাদের চিন্তা-চেতনা এতই বিকৃত হয়েছে যে, আল্লাহর আযাবের ভয়ের সামান্য চিহ্নও তাদের অন্তরে অবশিষ্ট নেই, তাঁর শাস্তির সতর্কবাণীকে উপহাস করছে। হযরত লূত আ. তখন আল্লাহর নিকট নিজের ও পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তার জন্যও তাদের ঈমানের হেফাযতের দু'আ করলেন, যাতে তারাও তাঁর জাতির গর্হিত কমে লিপ্ত হয়ে খারাপ পরিণতির শিকার না হয় ঃ

رَبِّ نَجِّنِىْ وَاَهْلِىْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ.

ওহে আমার রব! আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজনকে জাতির লোকেরা যা করে তা হতে রক্ষা করুন। (সূরা আশ-শূ'আরা ঃ ১৬৯)।
অতঃপর জাতির অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে রক্ষার জন্য লূত আ. মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন।

رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ.

"ওহে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন।" (সূরা আল-আনকাবূত ঃ ৩০)
অবশেষে হযরত লূত আ.-এর প্রতি নির্দেশ হলো যে, তিনি যেন তার পরিজন সহ রাত্রি কালে সামুদ ত্যাগ করেন, পথিমধ্যে তাদের কেউ যেন পশ্চাতে ফিরে না তাকায় এবং তাদেরকে যে এলাকায় সরে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারা যেন সেথায় চলে যান, কারণ প্রত্যুষেই সাদুমবাসীকে সমূলে ধ্বংস করা হবে। (সূরা হূদ ঃ ৮১, ও আল হিজর ঃ ৬৫)।
অতঃপর তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয় ঃ

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ.

"আমি তাদের উপর ভীষণভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করছিলাম। সুতরাং অপরাধীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা লক্ষ্য কর। (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৮৪)।

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ.

"অতঃপর সূর্যোদয়ের সময়ে মহানাদ তাদেরকে আঘাত করলো। আর আমি জন পদকে উল্টিয়ে উপর নীচ করে দিলাম এবং তাদের উপর প্রস্তর কংকর বর্ষণ করলাম। (সূরা আল হিজর ঃ ৭৩-৭৪)।
হযরত ইবরাহীম আ.-এর ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত লূত আ. নবুওয়াতী দায়িত্ব প্রাপ্তির পর হতে সুদীর্ঘ বিশ বছর যাবৎ "সাদুম"বাসীর নিকট মহান আল্লাহর বাণী প্রচার করে তাদেরকে নৈতিক চরিত্র ও উন্নত আল্লাহভীরু জীবন যাপনের দাওয়াত দেন, তাদেরকে গর্হিত ও নোংরা কার্যাবলী পরিত্যাগ করাবার চেষ্টা করেন। শেষে তারা ঈমান গ্রহণ না করে উল্টো নবীকে অত্যাচার করার হুমকী দেয়। পরে মহান আল্লাহ তার নবীকে অত্যাচারীদের হাত থেকে রক্ষা করেন ও তাদেরকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দেন।

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ঃ ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ১৯, পৃষ্ঠা ঃ ১০৩-১১৮

আধুনিক তুরস্কে ইসলামের পুনরুত্থান

মোহাম্মদ আনিসুর রহমান

মুসলিম নেতৃত্বে তুরস্কের ভূমিকা
৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে রসূলুল্লাহ স. এর ইন্তেকালের পর মুসলিম রাষ্ট্রের নেতৃত্ব কার হাতে থাকবে সে বিষয়ে সাহাবীরা ঐক্যমতে পৌঁছতে পারছিলেন না। রসূলুল্লাহ্ স. এর অধিকাংশ সাহাবী যোগ্যতার বিবেচনায় খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে রায় দিলেও কিছু অংশ মনে করলেন মুসলমানদের নেতৃত্ব ও ইমামতি শুধুমাত্র রসূলুল্লাহ্ স. এর পরিবারের জন্য নির্ধারিত থাকবে। তারা এ ক্ষেত্রে প্রথমে রসূলুল্লাহ্ স. এর চাচাতো ভাই, জামাতা এবং প্রধান সহকারী আলী ইবনে আবু তালিব রা. এর নাম প্রস্তাব করলেন। তাদের মতে, এরপর হযরত আলী রা. এর ছেলেরা এবং তাদের পুরুষ বংশধররা এই খিলাফত ও ইমামতির দায়িত্ব পালন করবেন। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী যারা বিশ্বাস করেন যে, তারা রসূলুল্লাহ্ স. এর অনুসারী, (যারা সুন্নী মুসলিম নামে পরিচিত) তাদের মতে যেহেতু খলিফা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বের প্রতীক, সেহেতু খলিফা সেই ব্যক্তিই হবেন যিনি তাক্ওয়ার ভিত্তিতে এবং মুসলমানদের নেতৃত্ব দানে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবেন। এখানে এটা অত্যাবশ্যক নয় যে তাকে রসূলুল্লাহ্ স. এর পরিবারের লোক হতে হবে।

এই সব যোগ্যতা বিবেচনায় রসূলুল্লাহ্ স. এর নিকটতম সাহাবীগণ হযরত আবু বকর রা. কে মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা নিযুক্ত করলেন এবং এর মাধ্যমে ইসলামী গণতান্ত্রিক যাত্রার সূচনা হয়। হযরত আলী রা. কে যারা খলিফা নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন তাঁরা একটা পৃথক দলে বিভক্ত হলেন এবং পরবর্তীতে তারা শিয়া মতাবলম্বী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

পরবর্তী ৬ শত বছর বিভিন্ন খলিফা মুসলিম বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রথমে চারজন খলিফা হযরত আবু বকর রা. হযরত ওমর রা., হযরত ওসমান রা. এবং হযরত আলী রা. মুসলিম নেতাগণ দ্বারা গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে খেলাফত বংশীয় ধারাবাহিকতায় চলে গেল এবং দু'টি শাসক

লেখক : প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ, ঘিওর সরকারী কলেজ, মানিকগঞ্জ।

বংশঃ একটি উমাইয়া যারা দামেস্ক থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করে ছিলেন, আর অপরটি হল আব্বাসীয় যারা বাগদাদ থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। ১২৫৮ সালে মোঙ্গলরা বাগদাদ দখল করার পর আব্বাসীয় খিলাফতের অবসান ঘটে এবং এরপর ২৫০ বছর সুন্নী মুসলিম কর্তৃক নির্বাচিত কোন খলিফা ছিল না। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে অটোম্যান সাম্রাজ্যের সূচনা ঘটে। পরবর্তীতে তারা অটোম্যান সাম্রাজ্য এবং এর বাইরে সুন্নী মুসলমানদের নিকট মুসলিম বিশ্বের খলিফা হিসেবে বিবেচিত হন। অটোম্যানদের প্রধান রাজধানী ছিল তৎকালীন কনসটানটিনপোল যা বর্তমানে তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুল হিসেবে পরিচিত।[১]

তুরস্কে ইসলামের বিকাশ

সপ্তম শতকের শেষ দিকে তুর্কী ভাষাভাষী উপজাতীয় লোকজন (যাঁরা পশ্চিমাঞ্চল থেকে মধ্য এশিয়ায় স্থানান্তরিত হয়েছিল) ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে শুরু করে। তাঁরা সুন্নী ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলামী ধর্মমতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে। ইসলামী যোদ্ধা বা গাজী যারা বাইজানটাইনস্‌দের ১০৭১ সালে মনজিকার্টের যুদ্ধে পরাজিত করেছিল তাঁরা আনাটলিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে তুর্কী অভিবাসীরা সুফী মতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং ধীরে ধীরে তা শিয়া বিশ্বাসে রূপ ধারণ করে। এদেরই একটা অংশ উত্তর পশ্চিম ইরানে বসবাস শুরু করে।[২]

অটোম্যান সালতানাত

অটোম্যান সালতানাতের সময়কাল ছিল ১২৯৯ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত। তাঁরা তাঁদের ক্ষমতার উচ্চ শিখরে পৌছায় ১৬ এবং ১৭ শতাব্দীতে। তিনটি মহাদেশ জুড়ে তাঁদের রাজত্বের বিস্তৃতি ছিল। এর মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকা অন্তর্ভুক্ত ছিল। অটোম্যান সাম্রাজ্য ২৯টি প্রদেশ এবং আরো কিছু কিছু ছোট রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত ছিল।[৩] অটোম্যান সময়কালে কনসটানটিনপোল বা ইস্তাম্বুল ছিল মুসলিম বিশ্বের এবং মুসলিম শাসকদের কেন্দ্রবিন্দু। অটোম্যান সুলমতান সেলিমের সময় সালতানাতকে খিলাফতে রূপান্তরিত করা হয় সুলতানরা খলিফা হিসেবে বিবেচিত হন।[৪] খলিফা হলো সেই ব্যক্তি যিনি মুহাম্মদ স. এর নেতৃত্বের অনুসরণ করেন এবং নিজেদেরকে ইসলামের তিনটি পবিত্র স্থান মক্কা, মদীনা এবং জেরুযালেম এর খাদেম মনে করেন।[৫] খলিফাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলমানদের অভিভাবক বিবেচনা করা হয়। অটোম্যান সুলতানগণ বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের রাজনৈতিক নেতা বিবেচিত হতেন।[৬]

এক নজরে অটোম্যান সালতানাত ঃ

অটোম্যান সাম্রাজ্য ঃ ১২৯৯-১৯২৩

রাজধানী ঃ সওগাত (১২৯৯-১৩২৬)

বুরসা (১৩২৬-১৩৬৫)
এডিরন (১৩৬৫-১৪৫৩)
কনসটানটিনপোল (পরবর্তীতে ইস্তাম্বুল)
(১৪৫৩-১৯২২)
সরকার পদ্ধতি ঃ ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রতন্ত্র।
সুলতান ঃ ১২৮১-১৩২৬ (প্রথম) ওসমান ১
১৯১৮-১৯২২ (শেষ) মাহমুদ ৬
ইতিহাস ঃ
উদয় ঃ ১২৯৯-১৪৫৩
বৃদ্ধি ঃ ১৪৫৩-১৬৮৩
সুদূর পর্যন্ত বিস্তৃতি ঃ ১৪৫৩-১৫৬৬
বিদ্রোহ এবং পুনঃরুদ্ধার ঃ ১৫৬৬-১৬৮৩
নিশ্চল এবং পুনর্গঠন ঃ ১৬৯৯-১৮২৭
ক্ষয়প্রাপ্ত এবং আধুনিকায়ন ঃ ১৮২৮-১৯০৮
পতন ঃ ১৯০৮-১৯২২[৭]

অটোম্যান ও তাঁর পূর্বসূরীরা ইসলামী জীবন ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে অনেক অবদান রেখেছেন। অনেক সূফী তুরস্কের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন বহু বিখ্যাত আলেম ও সূফীসাধক, যারা বিখ্যাত সূফী মাওলানা জালালউদ্দিন রুমী র. এর অনুসারী ছিলেন। জালালউদ্দীন রুমী রহ. ১২০০ সালের দিকে তুরস্কের কোনিয়ায় তার আস্তানা প্রতিষ্ঠা করেন।[৮]

অটোম্যান সুলতানরা ছিলেন ধর্মতান্ত্রিক। সেখানে মুসলমানদের জন্য আইন ছিল সম্পূর্ণ ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক; খ্রিষ্টান এবং ইহুদীরা তাদের নিজস্ব আইন দ্বারা পরিচালিত হত। ১৮ শতাব্দী পর্যন্ত ধর্মীয় আইন দ্বারাই সাম্রাজ্যের শাসনকার্য চলতো।[৯]

অটোম্যানদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

অটোম্যান সরকার অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে বুরসা, এডিন এবং কনসটানটিপোল (ইস্তাম্বুল) শহর গড়ে তুলে ছিলেন। সেখানে গড়ে উঠেছিল বড় বড় বাণিজ্যিক শিল্প কেন্দ্র, যা ভিন্ন দেশের ব্যবসায়ী, কারিগর ও শিল্পীদের আকৃষ্ট করেছিল। খলিফা মাহমুদ এবং তাঁর উত্তরসূরী বায়েজীদ ইহুদীদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রে এসে বসবাস করার ব্যাপারে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং তাঁরা কনসটানটিনপোল ও সেলোনিকার মত বন্দর নগরীতে বসতি স্থাপন করে।[১০] বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে তখন ইহুদীরা তাঁদের খ্রিস্টান প্রতিপক্ষের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছিল। অটোম্যান খলিফাদের সহনশীল মনোবৃত্তি অভিবাসী ইহুদীদের স্বস্তি এনে দিয়েছিল।

অটোম্যানদের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা মধ্যপ্রাচ্যের তথা আরবদের চিন্তাধারার সাথে মিল ছিল। আরবদের মতো তাঁদেরও সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটানো, নতুন নতুন সম্পদ আহরণ ও রেভিনিউ বৃদ্ধি ছিল অর্থনৈতিক চিন্তাধারার মূল ভিত্তি। সামাজিক অবক্ষয় রোধ এবং ধর্মীয় ঐতিহ্য সমুন্নত রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছিল অটোম্যানদের অন্যতম অর্থনৈতিক মতাদর্শ।[১১]

অটোম্যানদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা অন্যান্য সকল মুসলিম সরকারের চেয়ে অত্যন্ত সুসংগঠিত ছিল। তাঁরাই প্রথম কারণিক আমলাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন যা উন্নত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আলেম সম্প্রদায় এবং অন্যান্য পেশাজীবীদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। পেশাগত দক্ষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন এই পেশাজীবিরাই অটোম্যান শাসকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি ছিলেন।[১২]

অটোম্যান সাম্রাজ্যের অবকাঠামো তাদের ভৌগলিক অবস্থানের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল। অটোম্যানরা ছিলেন পূর্ব ও পশ্চিমের ঠিক মাঝখানে। ফলে স্প্যানীয় ও পতুর্গীজদের পূর্বমূখী সড়ক পথের অগ্রযাত্রাকে বন্ধ করে দিয়ে তাদের বাধ্য করেছিলেন সমুদ্র পথে প্রাচ্যের দিকে নতুন পথের সন্ধান করতে। মার্কোপোলো এক সময় যে পথ ব্যবহার করতেন অটোম্যানরা তা নিজেদের কব্জায় রেখেছিলেন।[১৩] ১৪৯২ সালে যখন ক্রিস্টোফার কলম্বাস প্রথম বাহামার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখন অটোম্যানরা ক্ষমতার স্বর্ণ শিখরে অবস্থান করছিলেন এবং তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা তিনটি মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। আধুনিক অটোম্যান গবেষকদের মতে, অটোম্যান ও মধ্য ইউরোপের মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটলো তখন, যখন ইউরোপ সমুদ্র পথে নতুন গন্তব্যের সন্ধান পেল। সমুদ্র পথ উম্মোচনের ফলে পূর্ব পশ্চিমের সড়ক পথের প্রয়োজনীয়তা কমে আসলো, কারণ মধ্যপ্রাচ্য ও মেডিটারিয়ান অঞ্চলে যাওয়ার জন্য অটোম্যান সরকারের জন্যও সমূদ্র পথ বিকল্প রাস্তা হিসেবে ব্যবহার শুরু হয়। এরপর এ্যাংলো অটোম্যান চুক্তির (যা 'বালটা লিম্যান চুক্তি' হিসেবে পরিচিত) ফলে অটোম্যান বাজারে ইংরেজ এবং ফরাসীরা সরাসরি প্রবেশের সুযোগ পায়। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এই চুক্তিকে অটোম্যানদের জন্য আত্মঘাতি চুক্তি হিসেবে সাব্যস্ত করেন।[১৪]

ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও যোগাযোগের উন্নয়ন মানুষকে নিজ দেশের কৃষি জমির সম্প্রসারণ করতে এবং বহির্বিশ্বে নিজ মালিকানায় ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করতে উদ্বুদ্ধ করে। তবে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার এই পথে পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদী ব্যবসা বাণিজ্য তখনো তাদের স্পর্শ করতে পারেনি।[১৫]

অটোম্যানসদের সামরিক ব্যবস্থা

সেনাবাহিনী ঃ অটোম্যান সাম্রাজ্যের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে প্রথম গঠিত হয় সেনাবাহিনী। ওসমান ১ এর আমলে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পশ্চিম আনাটলিয়ার

উপজাতীয় পুরুষদের নিয়ে প্রথম এ বাহিনী গঠিত হয়। অটোম্যান সাম্রাজ্যের অগ্রগতির সাথে সাথে একটি শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে।

এক সময় অটোম্যান আর্মি সবচেয়ে আধুনিক এবং দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হিসেবে পরিচিত ছিল। তারাই প্রথম গাদা বন্ধুক এবং কামান ব্যবহার শুরু করে। ১৪২২ সালে কনসাটনটিনপোল অভিযানের সময় অটোম্যান আর্মি ছোট ও চওড়া আকৃতির 'ফালকন' কামান ব্যবহার শুরু করে। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝের দিকে অটোম্যান আর্মি দূর পাল্লার "Balyemez" নামক কামান ব্যবহার শুরু করে, যা জার্মানীর তৈরী "Faule metze" কামানের চেয়ে অনেক দূর পাল্লার এবং ধ্বংসাত্মক ছিল।[১৬]

নৌ-বাহিনী ঃ ১৯৩১ সালে অটোম্যান নেভী দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে তাদের অভিযান চালায় এবং ইউরোপীয় অঞ্চলে অটোম্যান সাম্রাজ্য বিস্তারের ভূমিকা রাখা শুরু করে। কামান ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অটোম্যান নেভীও প্রথম স্থানে রয়েছে। ১৪৯৯ সালে "Battle of Zonchio" ইতিহাসের প্রথম নৌ-যুদ্ধ যেখানে অটোম্যান যুদ্ধ জাহাজে কামান ব্যবহার করা হয়। অটোম্যান নেভী উত্তর আফ্রিকা, আলজেরিয়া এবং মিশরকে ১৫১৭ সালে অটোম্যান সম্যাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। ১৫৩৮ সালে "Battle of Preveza" এবং ১৫৬০ সালে "Battle of Djerba" মেরিটেরিয়ান সাগরে অটোম্যান নৌ বাহিনীর একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।[১৭]

বিমান বাহিনী ঃ অটোম্যান বিমান বাহিনী ১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা যুদ্ধ বিমানের ক্ষেত্রে প্রথম উদাহরণ। অটোম্যান সম্রাট দু'জন তুর্কী পাইলটকে প্যারিসে এ্যাভিয়েশন কনফারেন্স-এ পাঠান। এরই পরপর বিমান বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়। বিমান বাহিনীর গুরুত্ব অনুধাবন করে অটোম্যান শাসকগণ নিজস্ব বিমান বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯১০ সালের দিকে কয়েকজন সেনা-কর্মকর্তাকে যুদ্ধ বিমান সম্পর্কীয় পড়াশোনার জন্য ইউরোপে পাঠান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোম্যান বিমান বাহিনী বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ করে। এর মধ্যে পশ্চিমে প্লাসিয়া লোকে পূর্বে ককেসাস এবং দক্ষিণে ইয়ামেনে যুদ্ধ করে। অটোম্যান বিমান বাহিনীর উন্নয়নে কাজ অব্যাহত থাকলেও ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের সাথে সাথে এবং ইস্তাম্বুল দখলের মধ্য দিয়ে অটোম্যান বিমান বাহিনীর অবসান ঘটে।[১৮]

অটোম্যান সাম্রাজ্যের পতন ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে কনসটানটিনপোল দখল হলে তুর্কীদের জাতীয় স্বাধীকার আন্দোলনের সূচনা হয়। এর ধারাবাহিকতায় তুরস্কের স্বাধীনতার সংগ্রাম (১৯১৯-১৯২২) মোস্তফা কামাল এর নেতৃত্বে সংগঠিত হয়।[১৯]

মোস্তফা কামাল তুরস্কবাসীর নিকট ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে একজন তুর্কী বীর এবং পরবর্তীতে তুরস্ক জাতির পিতা। তারই নেতৃত্বে ৩ বছরের স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯২৩ সালে তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের জন্ম হয়।[২০] ১৯২২ সালের পহেলা নভেম্বরে অটোম্যান সালতানাতের অবসান ঘটে এবং শেষ সুলতান এবং সুন্নী মুসলিমের শেষ খলিফা মাহমুদ ৬, ১৭ইং নভেম্বর ১৯২২ সালে তুরস্ক ত্যাগ করেন এবং তুরস্কের নতুন স্বাধীন গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলী ১৯২৩ সালের ২৪শে জুলাই বিশ্ববাসীর স্বীকৃতি লাভ করে। গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলী ১৯২৩ সালের ২৯শে অক্টোবর তুরস্ককে সরকারীভাবে প্রজাতান্ত্রিক তুরস্ক ঘোষণা করে। ১৯২৪ সালের ৩রা মার্চ খিলাফতকে সাংবিধানিকভাবে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। সুলতান এবং তাঁর পরিবারে ব্যাপারে 'Persona non grata'[২১] ঘোষনা করা হয় এবং তুরস্ক থেকে নির্বাসনে পাঠানো হয়।[২২]

অতঃপর ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় বারের মত মুসলিম উম্মাহ্ নেতৃত্ব শূন্য হয় এবং ১৯৬৯ সালে OIC প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের অভিভাবকত্বের আসনটি শুন্য হয়ে পড়ে।

ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের প্রতিষ্ঠা

নতুন তুরস্ক গঠন করার ক্ষেত্রে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ ছিল মোস্তফা কামালের অন্যতম নীতি।[২৩] বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে কামাল আতাতুর্ক মনে করলেন ধর্মপন্থী সরকার তুরস্কের সামাজিক, বাণিজ্যিক এবং কূটনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক বাঁধা সৃষ্টি করেছে। এজন্য তিনি যে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করলেন তা ছিল সম্পূর্ণ ধর্ম নিরপেক্ষ। ধর্মকে সরকার ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করাই ছিল তার রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি। তুরস্কের সশ্রস্ত্রবাহিনীকে সাংবিধানিকভাবে দেশের গণতন্ত্র এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা রক্ষার দায়িত্ব দিলেন।[২৪]

মোস্তফা কামাল চেয়েছেন তুরস্কের নাগরিকগণ তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করবে এবং পুরানো ধারার ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত হবে। তিনি চেয়েছেন, তাঁর দেশবাসী আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ও বিজ্ঞান শিক্ষায় নিজেদের শিক্ষিত করবে। কামাল সরকার অটোম্যান শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বদলে ফেলেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে সবার জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়। গ্রেড স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েট স্কুল পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিনামূল্য ও স্যাকুলার করা হয় এবং সহশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। এতে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে ছেলে এবং মেয়েদের সমান অধিকার দেয়া হয়।[২৫]

কামাল তুরস্কে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা নিষিদ্ধ করলেন তিনি ঘোষনা করলেন, যারা আরবী শিখতে চায় তারা সিরিয়া, আরব এবং অন্যত্র যেখানে আরবী ভাষায় কথা বলা হয় সেখানে গিয়ে শিখবে।[২৬]

কামাল ইসলামী ঐতিহ্য রক্ষার চেয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। তাঁর মতে, "অর্থই আমার নিকট সবকিছু যা আমাদের বাঁচার জন্য এবং সুখী হবার জন্য অত্যন্ত জরুরী।"[২৭]

কামাল ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষনা করলেন। তিনি চাইলেন, ইসলাম শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পর্যায়ে থাকবে। এবং এটা রাষ্ট্র কার্যক্রম ও অর্থনৈতিক উদ্যোগ থেকে পৃথক থাকবে। অটোম্যান সালতানাতের অবসান ঘটলেও খেলাফতকে তখনো বিলুপ্ত করা হয়নি। দেশের জনগণ তখনো ইসলামের ঐতিহ্যমতে, খলিফাকে রাষ্ট্রের প্রধান মনে করতো। ফলে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী ও খেলাফতের মধ্যে সম্পর্ক পরিষ্কার ছিল না। কামাল চাইত না যে, খলিফাদের প্রভাব জনগণের মধ্যে থাকুক, বিশেষ করে তিনি যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিলেন তা যেন প্রভাবিত না হয়।[২৮] যখন ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী তুরস্ককে প্রজাতন্ত্র ঘোষনা করল তখন ইসলামী রক্ষণশীলদের বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, ইসলামী খেলাফতের অবসান এখন সময়ের ব্যাপার। ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলী বছরের প্রথম অধিবেশনেই রাজকীয় পন্থায় ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ার অবসান ঘটিয়ে ৬২৫ বছরের অটোম্যান সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘোষণা করে।[২৯] সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদী ও পুরাতন ইসলামী হুকুমতের অবসান তুরস্ক এবং এর বাইরের সুন্নী মুসলিমদের দারুনভাবে আহত করে।[৩০]

খেলাফতের অবসানের পর তুরস্ক সরকারের সাথে প্রথম সংঘাত শুরু হয় তুরস্কে বসবাসরত কুর্দি জনগোষ্ঠীর সাথে। কুর্দিরা মুসলমান এবং তাদের সাথে খেলাফতের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। খেলাফতের বিলুপ্তির সাথে সাথে রাষ্ট্রের সাথে তাদের চুক্তির অবসান ঘটে। ফলে তারা নিজস্ব রাষ্ট্র গঠনের জন্য আন্দোলন শুরু করে। কামাল সরকার তাদেরকে তুরস্কের নাগরিক হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেয়ার আহবান জানায়। সরকারী কাজে কুর্দি ভাষা ব্যবহার এবং কুর্দি ভাষা শিক্ষাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কুর্দি উপজাতীয় নেতা এবং তাদের অনুসারীরা পশ্চিম তুরস্কে বসবাস শুরু করে। তুরস্ক সরকারের বিরুদ্ধে কুর্দি আন্দোলন তখন থেকেই সোচ্চার হয়।[৩১]

ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজ প্রতিষ্ঠার পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং সুফী দরবেশদের আবাসস্থল বন্ধ করে দেয়া হয়। কামাল তুরস্কের ঐতিহ্যবাহী টুপি (ফেজ) পরাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তুর্কীরা ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে পশ্চিমা পোশাক পরিধান করে আসছিল কিন্তু তাঁরা ধর্মীয় ঐতিহ্য ও অটোম্যান ঐতিহ্যকে ধারণ করার জন্য বিশেষ ধরনের টুপি (যার নাম ফেজ) পরিধান করতো। পশ্চিমা 'হ্যাট' পরাকে তারা ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্নতা মনে করতো।

এসব আবেগ-অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও কামাল সরকার ১৯২৫ সালের নভেম্বরে 'ফেজ' পরাকে নিষিদ্ধ করে।[৩২]

১৯২৬ সালে কামাল সরকার বিচার কাঠামোর সংস্কার শুরু করে। ধর্মীয় আদালতের পরিবর্তন করা হয়। ইসলামী আইনের স্থান দখল করে সুইস্ ও ইতালীয় 'পেনাল ল'। আগে ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ও আইন বিশেষজ্ঞরা আইন পেশায় নিয়োজিত হতে পারতেন। কামাল সরকারের আমলে যারা শুধুমাত্র পশ্চিমা আইন বিষয়ে লেখাপড়া করে তারাই কেবল ওকালতি (বার) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। একই সাথে সরকার ১৯২৬ সাল থেকে ইসলামী ক্যালেন্ডারের পরিবর্তে পশ্চিমা ক্যালেন্ডার চালু করে।[৩৩]

১৯২৬ সালে কামালকে হত্যার চেষ্টা করা হয় যা "Coup d'etat' নামে পরিচিত। এতে প্রখ্যাত রাজনীতিবিদসহ অসংখ্য ইসলামপন্থীও কামাল বিরোধী ব্যক্তিবর্গকে গ্রেফতার করা হয়। চারজনকে ফাঁসি দেয়া হয় এবং অন্যদেরকে জেলখানায় পাঠানো হয়।[৩৪]

মোস্তফা কামাল পহেলা নভেম্বর ১৯২৭ সালে পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এরপর ১৯২৮ সালে শিল্প সাহিত্য সংস্কারের কাজ শুরু করেন। তুর্কী ভাষার জন্য ব্যবহৃত আরবী হরফকে ল্যাটিন অক্ষর দ্বারা পরিবর্তন করা হয়। পবিত্র কুরআনকে তুর্কী ভাষায় নতুন অক্ষরে অনুবাদ করা হয়। কামাল তুরস্কের মসজিদগুলোতে আরবীর পরিবর্তে তুর্কী ভাষায় ধর্মীয় আলোচনা করার জন্য ইমামদের বাধ্য করেন।[৩৫]

১৯৩৪ সালে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী পর্দা প্রথা বাতিল করে। মেয়েদের মাথায় স্কার্ফ পরাকে সরকার রাজনৈতিক ইসলামের অংশ মনে করে এবং সরকারী কার্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য অফিস আদালতে স্কার্ফ পরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এ স্কার্ফের ব্যবহার শুধুমাত্র ধর্মীয় কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়।[৩৬]

১৯৩৮ সালের ১০ই নভেম্বর বেশ কয়েক মাসের রোগ ভোগের পর কামালের মৃত্যু ঘটে। মোস্তফা কামাল তাঁর অনুসারী জনগণের নিকট ছিলেন আধুনিক তুরস্কের স্থপতি। আর মুসলিম চিন্তাবিদও ইসলামী বুদ্ধিজীবীদের কাছে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন একজন বিশ্বাসঘাতক ও মুরতাদ হিসেবে।[৩৭]

ইসলামী রাজনৈতিক দলের বিকাশ ঃ তুরস্ক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কোন দেশে ধর্ম নিরপেক্ষ গণতন্ত্রের প্রথম উদাহরণ। তুরস্কে ১৯৯০ সালের দিকে ইসলামিক রাজনৈতিক দলের বিকাশ শুরু হয়। চারটি ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল যেমনঃ ওয়েলফেয়ার পার্টি, ভারচু পার্টি, হ্যাপিনেস পার্টি এবং জাস্টিস এণ্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (AKP, Adalet ve Kalkýnma Partisi) এই অগ্রযাত্রার নেতৃত্ব দেয়।[৩৮]

১৯৯৫ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ইসলামপন্থী ওয়েলফেয়ার পার্টি ২১ শতাংশ ভোট পেয়ে সরকার গঠনের সুযোগ পায়। তাদের ভোট ছিল অন্যান্য সকল পার্টির দলগত ভোটের চেয়ে বেশি। ফলে তারা সরকার গঠনের অনুমতি পায় এবং কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। অনেকেই বিশ্বাস করে ওয়েলফেয়ার পার্টির এই বিজয়ের পেছনে তাদের সমর্থনের চেয়ে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের দুর্নীতি ও অকার্যকর ভূমিকার বিরুদ্ধে "Protest votes" অনেক বেশী কাজ করেছিল।[৩৯]

১৯৯৭ সালের মধ্যে ওয়েলফেয়ার পার্টির নেতৃবর্গ ধর্ম ও রাজনীতি সংমিশ্রণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সংবিধানের বেঁধে দেয়া নিয়মানুসারে সশ্রস্ত্র বাহিনী তাদের বাঁধা প্রদান করে এবং পরবর্তীতে আদালত ওয়েলফেয়ার পার্টির কার্যক্রমকে নিষিদ্ধ করে। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার পর ধর্মনিরপেক্ষ দল পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।[৪০]

২০০২ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে একটি নতুন সংস্কারকৃত আধুনিক ইসলামিস্ট পার্টি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীতে সংখ্যাগরিষ্ট আসন লাভ করে এবং এক দশক পর একক সরকার গঠন করে। পুনরায় পুরাতন অকার্যকর এবং দুর্নীতিগ্রস্থ রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে বিপুল সংখ্যক জনগণ জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টিকে ভোট প্রদান করে।[৪১]

নতুন নির্বাচিত জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির সরকার সম্পূর্ণ সেক্যুলার পন্থায় রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করে, কিন্তু ইসলামের আত্মিক ও নৈতিক নীতিমালা তাদের চলার পথের নির্দেশিকা ছিল। তাঁরা তাঁদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ইউরোপ, ইসরাঈল ও আমেরিকার সাথেও সম্পর্ক উন্নয়নে সক্ষম হয়।[৪২]

২০০৭ এর সাধারণ নির্বাচন জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (AKP) নিজেদেরকে একটি মধ্যপন্থী রক্ষণশীল এবং পশ্চিমাঘেষা নীতির অনুসারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। তারা তুরস্কের জন্য উদার বাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা এবং তুরস্কের ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্তির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।[৪৩] ২০০৭-এর সাধারণ নির্বাচনে AKP-এর ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী রিসেপ তাইয়েফ এরদোগানের নেতৃত্বে ৪৬.৬% ভোটসহ বিশাল বিজয় অর্জন করে এবং সংসদের ৫৫০টি আসনের মধ্যে ৩৪১টি আসন লাভ করে। AK পার্টি ২০০২-এর তুলনায় ২০০৭এ শুধু বেশী ভোট পেয়েছে তা নয়; বরং তুরস্কের ৭৪ বছরের ইতিহাসে দ্বিতীয় বারের মত কোন ক্ষমতাসীন দল আনুপাতিক হারে অধিক সংখ্যক জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছে।[৪৪] ২০০২-এর চেয়ে ২০০৭-এ অধিক ভোট পাওয়া সত্ত্বেও তুরস্কের নির্বাচন বিধিমালার কারণে পূর্বের চেয়ে জাতীয় সংসদে তাদের আসন সংখ্যা কম ছিল। এতদসত্ত্বেও তারা একক সংখ্যাগরিষ্ট দল হিসেবে ক্ষমতা রক্ষার প্রয়োজনীয় আসন লাভ করে।[৪৫]

এরদোগান সরকারের কিছু কর্মসূচী অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ঃ ৩১শে আগস্ট ২০০৭ইং তারিখে নতুন সরকার তার নতুন কর্মপন্থা ঘোষণা করে।

১. সংবিধান ঃ সংবিধানের সংস্কার করা হবে। যাতে এটা সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্ট হয়। এতে আইন পাশ করার পদ্ধতি, আইন প্রয়োগ এবং সংসদীয় গণতন্ত্রে বিচার বিভাগের ভূমিকা পরিষ্কারভাবে বিবৃত থাকবে।

২. গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা ঃ সরকার একটি শক্তিশালী সিভিল সোসাইটি তৈরীতে খোলামেলাভাবে কাজ করবে, যাতে সবাই আরও বেশী গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সুবিধা ভোগ করতে পারে।

৩. অর্থনীতি ঃ ২০১৩ সালের মধ্যে মাথাপিছু আয় ১০,০০০ USD তে পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। তখন পর্যটন শিল্প থেকে আয়ের পরিমাণ হবে ৪০ মিলিয়ন ডলার। ২০০৮ সালে পর্যটন শিল্প থেকে ভ্যাট (VAT)-এর পরিমাণ ১৮% থেকে ৮%এ কমানো হয়েছে।

৪. অবকাঠামোগত সংস্কার ঃ অবকাঠামো উন্নয়নে স্থানীয় সরকার এবং জনসেবা খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হবে।

৫. শিক্ষা ঃ ৫% শিশুকে প্রাক বিদ্যালয় শিক্ষা প্রদান করা হবে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০-এর মধ্যে হবে।

৬. 2B শ্রেণীর বনাঞ্চলঃ যেসকল পুরাতন বনভূমির স্থায়ীত্বের সীমা কমে এসেছে। সেখান থেকে বিভিন্ন বনজ সম্পদ বিক্রি করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ২৫ মিলিয়ন ডলার জমা করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৭. বিদেশ সম্পর্কীয় নীতি ঃ সরকার ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সংস্কার উদ্যোগ ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট হবে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে তাদের সম্পর্ক উন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।[৪৩]

৮. ২০০৮ সালে AK পার্টি নিষিদ্ধকরণ প্রস্তাব ঃ ১৪ মার্চ ২০০৮ সালে তুরস্কের প্রধান রাষ্ট্রীয় আইনজীবি (Chief Prosecutor) দেশের সাংবিধানিক আদালতে সংবিধান লংঘনের অভিযোগ এনে AK পার্টি এবং এরদোগানকে পাঁচ বছরের জন্য রাজনীতি থেকে নিষিদ্ধ ঘোষনার জন্য আবদন জানায়। চীফ প্রসিকিউটর তার অভিযোগে বলেন, প্রচলিত আইন অনুযায়ী যদি কোন রাজনৈতিক দল এমন কোন কার্যক্রম পরিচালনা করে যা রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থাকে নিঘ্নিত করে, তবে সংবিধান মতে প্রধান প্রসিকিউটর অফিসের প্রয়োজনীয় নথিসহ আদালতের স্মরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা রক্ষার দায়িত্ব তখনই শুরু হয়, যখন সেক্যুলারিজম যা সংবিধানের অংশ তা লংঘনের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। প্রধান প্রসিকিউটর অফিস আরও বিবৃত করে যে, এটা কোন ক্ষমতাসীন

দলের জন্য দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার যে, তাদের বিরুদ্ধে সেক্যুলারিজম বিরোধী কার্যক্রমের অভিযোগ আনা হয়েছে।[৪৭]

অভিযোগসমূহ ঃ প্রধান প্রসিকিউটর প্রধানমন্ত্রী এরদোগান এবং প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহগুলসহ AK পার্টির ৭১ জন সিনিয়র নেতার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগের কারণে ৫ বছর রাজনীতি থেকে নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী জানান ঃ

১. রাজনৈতিক ইসলামের বাহক AK পার্টি রাষ্ট্রীয় আইনের পরিবর্তন করতে চায়; পার্টির সদস্যরা ব্যক্তি এবং স্রষ্টার মধ্যকার বিষয়বস্তু নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে যা সংবিধান মতে রাজনীতিবিদদের জন্য নিষিদ্ধ।
২. AK পার্টির মধ্যে ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক নিয়ম-কানুন রয়েছে। পার্টির নেতা এরদোগান ২০০৮ সালের জানুয়ারীতে স্পেনে অভিযোগ করে বলেছেন যে, 'মাথায় স্কার্ফ' পরাকে যদিও আমরা রাজনৈতিক ইসলামের অংশ ধরে নেই তবুও সংবিধান এবং কোর্টের এটা নিষিদ্ধ করার কোন অধিকার নেই।
৩. AK পার্টি যে নির্বাহী ক্ষমতা ব্যবহার করে তার ভিত্তি হল মানুষের জন্য ধর্মীয় ব্যবস্থাপনা। এসব অভিযোগের কারণে সংবিধান এই দলটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারে।[৪৮]

অভিশংসনের ফলাফল ঃ দেশের ধর্মনিরপেক্ষ বা সেক্যুলার প্রক্রিয়াকে অবমূল্যায়ণ করার অভিযোগে সাংবিধানিক আদালত AK পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেনি। তবে পার্টির বার্ষিক বাজেটের অর্ধেক পরিমাণ জরিমানা নির্ধারন করে। AK পার্টির যারা ২০০৭-এর নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছিল, তারা তাদের বিরুদ্ধে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করার অভিযোগ অস্বীকার করে। তাদের মতে, এই মামলা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি চক্রান্ত। অত্যন্ত ক্ষমতাসীন সশস্ত্র বাহিনী মুস্তফা কামাল আতাতুর্কের গড়া সেক্যুলার রাষ্ট্র রক্ষার জন্যে মরিয়া এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে। সাংবিধানিক কোর্টের প্রেসিডেন্ট হাশিম ঝিলিক বলেছেন, "অর্থনৈতিক অনুদান হ্রাস ক্ষমতাসীন A.K.P-এর জন্য একটি বড় সতর্ক সংকেত"।

A.K.P কে নিষিদ্ধ ঘোষণার জন্য সাংবিধানিক আদালতের ১১ জন বিচারকের মধ্যে ৭ জনের রায়ের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ৬ জন বিচারক নিষিদ্ধ ঘোষণার পক্ষে রায় দেন এবং ৫ জন এর বিরুদ্ধে রায় দেন।[৪৯]

মাথায় স্কার্ফ পড়া ইস্যু ঃ ১৯৩৪ সালে ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলী পর্দা প্রথা বাতিল করে। আশির শতকের শুরুর দিকে কলেজ ছাত্রীরা যারা ইসলামের প্রতি দৃঢ়ভাবে অনুগত তারা মাথায় এবং গলা ঢাকার মত স্কার্ফ এবং লম্বা কাপড় পরিধান করা শুরু করে। মহিলাদের এই বাহ্যিক পরিবর্তন তুরস্কের সেক্যুলারপন্থীদের উদ্বেগের কারণ হয়। কারণ তারা এ ধরনের পোষাক ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতীক বলেই পরিত্যাগ করেছে। সেক্যুলারিজম-এর একনিষ্ঠ সমর্থকরা সে দেশের উচ্চ শিক্ষা

কাউন্সিলকে ১৯৮৭ সালে একটি রেগুলেশন জারী করতে বাধ্য করে; যাতে বলা হয় 'ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীকক্ষে মাথা ঢেকে রাখতে পারবে না।' এই রেগুলেশনের প্রতিবাদে হাজার হাজার মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ড্রেসকোডের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করার জন্য আবেদন জানায়। এই ইস্যু নিয়ে বিভাজন নব্বই দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলে। নব্বই দশকের প্রথম দিকে উচ্চ শিক্ষিত, স্পষ্টভাষী কিন্তু ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নারীরা জনসমুক্ষে মুখ ও হাত বাদে সম্পূর্ণ দেহ আবৃত করে বের হওয়া শুরু করে। তুরস্কের জনগণের মধ্যে এখনও নারীদেরকে ইসলামপন্থী না সেক্যুলারপন্থী পরিধেয় পোষাক তার পরিচয় বহন করে। তুরস্কের অনেক নারী ইসলামের প্রতীক এবং আধুনিক তুর্কী সমাজের প্রতি প্রতিবাদ হিসেবে মাথায় স্কার্ফ পরিধান করে।[৫০]

বর্তমানে সরকার এই আইন বাতিলের ব্যাপারে পদক্ষেপ নিয়েছিল। কিন্তু সেক্যুলারিজম এর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন সাংবিধানিক বিধি-বিধানের কারণে এখনও সফল হয়নি।

OIC প্রতিষ্ঠা ঃ ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বা OIC জাতিসংঘের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম আন্তঃ সরকার সমন্বিত একটি সংস্থা। এর সদস্য সংখ্যা ৫৭ এবং ৪টি মহাদেশ জুড়ে এর বিস্তৃতি। এই সংখ্যা মুসলিম দেশগুলোর সম্মিলিত কণ্ঠ এবং মুসলিম উম্মাহর নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ। OIC প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৯ সালে মরক্কোর রাবাতে অনুষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানের এক ঐতিহাসিক সম্মেলনের মাধ্যমে। যার প্রেক্ষাপট ছিল ইসরাঈল কর্তৃক পবিত্র আল-আকসা মসজিদে অগ্নিসংযোগ এবং পবিত্র নগরী জেরুজালেম দখল করার কারণে। OIC প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে খেলাফত বিলুপ্তির ৪৬ বৎসর পর (১৯২২-১৯৬৯) মুসলিম উম্মাহ নিজেদের একটি পরিচয় এবং অভিভাকত্ব খুঁজে পায়, যারা মুসলমানদের পক্ষে জোরালোভাবে কিছু বলতে পারে।[৫১]

OIC-এর বর্তমান নেতৃত্ব ঃ বর্তমান OIC-এর মহাসচিব হলেন একমেইদ্দিন ইহ্‌সানোগুল। তিনি তুরস্কের অধিবাসী। তিনি OIC-এর প্রথম ভোটে নির্বাচিত মহাসচিব। ২০০৫ সালে OIC-এর নবম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে তিনি বিশ্ব পরিস্থিতির এই কঠিন সময়ের ৫৭টি মুসলিম দেশের এই সংস্থার নেতৃত্ব বলিষ্ঠভাবে দিয়ে আসছেন।[৫২] OIC-তে তুরস্কের এই নেতৃত্বকে আমরা অন্যভাবে বলতে পারি, মুসলিম উম্মাহর নের্তৃত্ব খেলাফত অবসানের দীর্ঘ সময় পর আবার তুরস্কের হাতে এসেছে।

পরিশেষ ঃ মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বের ইতিহাসে তুরস্কের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন সংকটকালীন সময়ে তুরস্ক এই জাতির

নেতৃত্বের হাল ধরেছে। ১২৫৮ সালে মোঙ্গল কর্তৃক বাগদাদ দখলের মাধ্যমে আব্বাসীয় খেলাফতের পতন ঘটে। এরপর ২৫ বছর সুন্নী মুসলিমের নেতৃত্বের দাবীদার কেউ ছিল না। ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে অটোম্যানরা এই নেতৃত্বের ভার আবার বহণ করে। তাই খেলাফতের সর্বশেষ উদাহরণ এখনও তুরস্ক, তুরস্ক ইউরোপে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় দেশ। মুসলিম বিশ্বে সেক্যুলারিজম শুরু হয়েছে মুস্তফা কামালের নেতৃত্বে তুরস্কে। একটি মুসলিম দেশ ইসলামী আদর্শের প্রতীক টুপি (ফেজ) এবং স্কার্ফ পরা নিষিদ্ধ করতে পারে তারও উদাহরণ তুরস্ক। আবার সুফিইজম ও মিষ্টিক ইসলামের প্রকাশও বিকাশের দেশ তুরস্ক। এক্ষেত্রে অন্যতম একজন সুফী এবং তরীকতের প্রবক্তা মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী রহ. এর জন্মস্থান তুরস্ক। তাই তুরস্কের দিকে তাকালে মুসলিম ঐতিহ্যের বিভিন্ন দিক আমরা খুঁজে পাই। দি ইসলামিক কনফারেন্স ইয়োথ ফোরাম যার ডায়ালগ এন্ড কো-অপারেশন (ICYE-DC) এর প্রধান কার্যালয় তুরস্কে। দি রিসার্চ সেন্টার ফর ইসলামিক হিস্ট্রি, আর্ট এন্ড কালচার (IRCICA); দি স্টেটিসইটিক্যাল ইকনমিক এন্ড সোস্যাল রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার ফর ইসলামিক কান্ট্রিস (SESRIC) তুরস্কে অবস্থিত। মুসলিম উম্মাহর অন্যতম সংগঠন OIC-এর প্রতিষ্ঠাকালিন সদস্য তুরস্ক এবং OIC-এর বর্তমান মহাসচিব তুরস্কের নাগরিক। তুরস্কের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ইউরোপের মধ্যে থেকেও তুরস্ক বিশ্বের একমাত্র মুসলিম দেশ যেখানে একটি ইসলামিক পার্টি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পন্থায় বিপুল ভোটে (৪৬.৬%) জয়লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছে।

তাই রসূলুল্লাহ স.-এর ওফাতের পর যে গণতান্ত্রিক ইসলামের চর্চা শুরু হয়েছিল তার কিছু নমুনা আমরা তুরস্কে দেখতে পাই। আমরা এখন ভোটের মাধ্যমে নেতা নির্বাচন করি, তখন বিশিষ্টজনরা নেতা নির্বাচন করতেন। নির্বাচকমন্ডলীরাও আবার সর্বজন কর্তৃক স্বীকৃত ছিলেন। ইসলাম মানুষের স্বভাব ধর্ম, তাই এর প্রতি আকর্ষণ মানুষের জন্য সহজাত। তুরস্কের জাস্টিস এন্ড ডেভলপমেন্ট পার্টি এটা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে যে, ইসলামের জন্য কাজ করার জন্য কোন ইসলামী ব্যানারের প্রয়োজন নেই। ঘুষ, দুর্নীতি, সুদ এসবের বিরূদ্ধে ইসলাম সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাই এসব থেকে যে যত মুক্ত থাকবে এবং ইসলামের অর্থনৈতিক সুফল মানুষের নিকট পৌছে দিবে, সাধারণ মানুষ তাদেরকেই সমর্থন করবে। এতে কোন ইসলামিক ব্যানার থাকুক বা না থাকুক। আর ইসলামের ব্যানার নিয়ে মানবতার বিরূদ্ধে কাজ করলে, মানুষের জান-মালের ক্ষতি করলে ইসলামেরই ক্ষতি করা হবে। ইসলামে চরমপন্থার কোন স্থান নেই। রসূলুল্লাহ স. নিজে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন। তাই বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে মুসলমানদের তথ্য

জ্ঞানে অধিক সমৃদ্ধ হতে হবে। এ সময় পার হতে চলেছে যে, যারা অধিক পরিমান অর্থ, শ্রমিক এবং খনিজ সম্পদের মালিক তারাই বেশী ধনী ও উন্নত। বর্তমান সময়ে যারা তথ্য ও প্রযুক্তি জ্ঞানে বেশী সমৃদ্ধ তারাই বেশী উন্নত। মুসলমানদের তাই ধ্বংসের পরিবর্তে উন্নয়নের পথ অবলম্বন করতে হবে। মুসলমানদের ২১ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উপযুক্ত হতে হবে। ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং আধুনিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ মুসলমানরাই ইসলামের বিরূদ্ধে সকল চক্রন্তের মোকাবেলা করতে পারে, ইসলামের হারানো ঐতিহ্য পুনরূদ্ধারে প্রয়োজন একটি সৎ, ধার্মিক ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম জাতি।

তাই আমরা বলতে পারি, মুসলিম উম্মাহর বর্তমান সংকট মূহুর্তে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা এবং অগ্রযাত্রায় তুরস্কের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। তুরস্ক এশিয়া ও ইউরোপের অংশ জুড়ে সুবিধাজনক স্থানে রয়েছে। তাই তুরস্ক পারে মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করে নিজেদের নিরাপত্তা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পাস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিতে। তুরস্ক OIC-কে আরও শক্তিশালী করে এর কার্যক্রমকে মুসলিম উম্মাহর জন্য বাস্তব সম্মত করতে পারে; যাতে এই সংস্থাটি মুসলমানদের সমস্যা সমাধানে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে এবং মুসলিম উম্মাহর সম্মিলিত কণ্ঠ হিসেবে কাজ করতে পারে।

তথ্য সূত্র ঃ

১. http://countrystudies.us/turkey/36.htm
২. ibid.
৩. Retrived on 01/01/2009
৪. on 23/09/08
৫. Turkey and Islam, 1900-1930:
৬. http://www.turkeytravelplanner.com/Religion/Islam.html
৭. op.cit
৮. http://www.turkeytravelplanner.com/Religion/Islam.html
৯. ibid.
১০. Halil Ýnalcýk, Studies in the economic history of the Middle East : from the rise of Islam to the present day / edited by M. A. Cook. London University Press, Oxford U.P. 1970, p. 209
১১. ibid, p.217
১২. Antony Black (2001), "The state of the House of Osman (devlet-ý al-ý Osman)" in *The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present*, p. 199

১৩. ibid
১৪. Halil Ýnalcýk, Donald Quataert (1971), *An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300–1914*, p. 120
১৫. Halil inalcik, Studies in the economic history of the Middle East : from the rise of Islam to the present day, op.cit,p. 218
১৬. Mandel, Gabriele: "Storia dell'Harem" (1992).
১৭. Turksih Navy official website; History of the Turkish Navy-operations in the Altantic Ocean.
১৮. Ottoman Navy, op.cit
১৯. Mustafa Kemal Pasha's speech on his arrival in Ankara in November 1919
২০. Mohammad Anisur Rahman, Turkey: A Long Train of entering to the EU, Thoughts on Economics,
Islamic Economics Research Bureau, Dhaka, July-Sept 2008, P.77
২১. 'Persona non grata' is a diplomatic term by which a government can expel somebody from the existing country.
২২. Dissolution (1908–1922),
২৩. Republic Period, http://en.wikipedia.org/ wiki/ Islam_in_ Turkey
২৪. Secular Republic, http:// www.turkeytravelplanner. com/ Religion/Islam.html
২৫. Secularization, www.fsmitha.com/h2/ch09tu.html
২৬. ibid
২৭. A quote used by Andrew Mango in his book *Ataturk*, published by Overlook Press, p. 375.
২৮. Secularization, op.cit
২৯. ibid
৩০. ibid
৩১. ibid
৩২. ibid
৩৩. ibid
৩৪. ibid
৩৫. ibid

৩৬. ibid
৩৭. ibid
৩৮. The rise of political Islam in Turkey, http://www.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/0/8/3/6/7/p83675_index.html.
৩৯. Islamist Parties, http:/ /www.turkeytravelplanner. com/ Religion/Islam.html.
৪০. ibid
৪১. ibid
৪২. ibid
৪৩. New to tarkiish Politics ? Here's rougs Primer_Turkish's vote analysis and result's with turkish daily hews, July 22, 2007.
৪৪. General Elections, http:// en.wikipedia.org/ wiki/ Recep_ Tayyip_Erdo%C4%9Fan
৪৫. Elections-Turkish'2 vote anclysis and result's with turkish daily news.
৪৬. Prime Ministership,2007-Present; .
৪৭. Proposed ban, 2008; , Retrived on 23/06/08
৪৮. Initial Indictment, ibid
৪৯. BBC, http:// news.bbc.co.uk/ 2/hi/europe/ 7533414.stm, Wednesday, 30 July 2008 16:22 UK.
৫০. Headscarf Issue, http:// en.wikipedia. org/ wiki/ Islam_ in_ Turkey
৫১. About OIC, http:// www.oic-oci.org/ oicnew/ page_ detail.asp?p_id=52, Retrieved on 07/01/09
৫২. Biography of Ekmeleddin Ihsanoglu, http://www.oic-oci.org/oicnew/page_detail.asp?p_id=58.

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ঃ ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ১৯, পৃষ্ঠা ঃ ১১৯

সেমিনার রিপোর্ট-১

আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যেই প্রতিটি মানুষের নিরাপত্তা নিহিত

– ডঃ মোঃ আনসার আলী খান

স্বাগত বক্তব্য রাখছেন সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারী এড. মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

গত ১৮ এপ্রিল ২০০৯ ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এ লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ- এর উদ্যোগে 'ইসলামী আইনে জননিরাপত্তা' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। রিসার্চ মিলনায়তনে আয়োজিত উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, বিশিষ্ট গবেষক ড. মোহাম্মদ আনসার আলী খান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারী প্রবীন আইনজীবি এডভোকেট মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম। প্রবন্ধের উপর বক্তব্য রাখেন ড. এ বি এম মাহবুবুল ইসলাম, মাওলানা মকবুল আহমদ, বিশিষ্ট সাংবাদিক উবায়দুর রহমান খান নদভী, অধ্যক্ষ মোজাম্মেল হক, ব্যারিস্টার বেলায়েত হোসেন,ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিকী, মাওলানা ড. খলিলুর রহমান খান প্রমুখ। সভাপতির বক্তব্যে শাহ আবদুল হান্নান বলেন: বর্তমান সমাজে ইসলামী আইনের ইতিবাচক দিকগুলো ব্যাপকভাবে তুলে ধরা উচিত এবং যুগ সমস্যার সমাধানে ব্যক্তিগত ইজতিহাদের সাথে সাথে বোর্ড ও প্রাতিষ্ঠানিক ইজতিহাদের উপর জোর দেয়া জরুরী হয়ে পড়েছে। ইসলামী আইন গবেষকদের অতীত ও বর্তমান উভয় যুগের বিশেষজ্ঞ আলেমদের গ্রন্থ অধ্যয়ন করা ইচিত। স্বাগত ভাষণে এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বলেন, জননিরাপত্তার জন্যে বিশ্বের দেশে দেশে বহু আইন রচিত হয়েছে কিন্তু কোন আইনই জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি। কারণ ম্যানমেইড আইন কখনো মানুষের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না। যেহেতু আল্লাহ মানুষের সৃষ্টিকর্তা অতএব তিনিই ভালো জানেন, কোন আইনে মানুষের নিরাপত্তা সম্ভব। আমাদের বিশ্বাস ইসলামী আইনই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। ড. মাহবুবুল ইসলাম বলেন, ইসলামী আইনে জননিরাপত্তার ব্যাপারটি সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিকী কাশ্মীরের জননিরাপত্তা আইনের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, মানব রচিত জননিরাপত্তা আইন মূলত যুগে যুগে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও বিরোধীদের নিয়ন্ত্রণ ও নির্যাতনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে কাউকে আটক ও হয়রানী করা ইসলামী আইন সমর্থন করে না। অধ্যক্ষ মোজাম্মেল হক তার বক্তব্যে বলেন, জননিরাপত্তার নামে কারো মৌলিক ও ব্যক্তিগত অধিকার ক্ষুন্ন করা যায় না।

প্রবন্ধে বলা হয়: আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যেই মূলত জননিরাপত্তা নিহিত। জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ইসলামী আইনের দুটি দিক রয়েছে। একটি হলো মানুষকে আল্লাহর আইন তথা করণীয় পালনে জ্ঞাত ও উদ্বুদ্ধ করা। আর দ্বিতীয়টি হলো, কেউ আইন লংঘন করলে কঠোরভাবে তার শাস্তি প্রয়োগ করা। মানুষ ছাড়া অন্য কোথায়ও জীবজগতের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় কখনো কোন বিচ্যুতি লক্ষ করা যায় না। কারন সেখানে আল্লাহর আনুগত্য পূর্ন ভাবে বিদ্যমান। তাই আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে যাওয়াই হচ্ছে জননিরাপত্তার পূর্বশর্ত। – শ.ই.

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ঃ ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ১৯, পৃষ্ঠা ঃ ১২০-১২২

সেমিনার রিপোর্ট-২

নৈতিকতা বিবর্জিত সমাজ কারো জন্য কল্যাণকর হতে পারে না

- বিচারপতি লতিফুর রহমান

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ও সাবেক প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি লতিফুর রহমান বলেছেন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ছাড়া গণতন্ত্রের সফল চর্চা সম্ভব নয়। আবার স্বাধীন বিচার বিভাগ ছাড়া আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আইনের শাসন ছাড়া গণতন্ত্র নিরর্থক। তিনি বলেন, যে সমাজে আইনের শাসন নেই সে সমাজকে সভ্য সমাজ বলা যায় না। তাই সততা ও নৈতিক বোধ নিয়ে কাজ করতে হবে। তিনি মুহাম্মদ স.-এর উম্মত হিসেবে সকল কর্মকান্ড সততা ও নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করার আহ্বান জানান। তিনি উল্লেখ করেন, ইসলামী নৈতিকতার ভিত্তিতে চরিত্র গড়ে তুলতে হবে। তা না হলে ভালো মানুষ পাওয়া যাবে না। নৈতিকতা বিবর্জিত সমাজ কারো জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। আইনের সাথে নৈতিকতা বোধও থাকতে হবে। গতকাল শুক্রবার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে 'ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ' আয়োজিত 'আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। সেন্টারের চেয়ারম্যান ও সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মাইমুল আহসান খান, বাংলাদেশ ইসলামিক ইউনিভার্সিটির আইন অনুষদের ডীন ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ড. মানজুর ইলাহী, ব্যারিস্টার মুন্সী আহসান কবির, ব্যারিস্টার নাছের আলম, ব্যারিস্টার বেলায়েত হোসাইন, ব্যারিস্টার এওয়াইএম ফজলুর রহমান, ব্যারিস্টার ইমরান এ সিদ্দিক, প্রিন্সিপাল মাওলানা মুজাম্মেল হক, এডভোকেট কামরুজ্জামান, তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মুফতি মাওলানা আবু ইউসুফ প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইএলআরসি'র জেনারেল সেক্রেটারি এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মোঃ আনসার আলী খান।

বিচারপতি লতিফুর রহমান তার বক্তব্যে বলেন, সকল কর্মকান্ডের পেছনে নৈতিকতা বোধ ও সততা থাকতে হবে। তা না হলে কোন কাজেই সুফল পাওয়া যাবে না। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল কর্মকান্ডের সাথে নৈতিক মূল্যবোধের সমন্বয় থাকতে হবে। সে জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় নৈতিকতার মূল্য অনেক জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, আমাদের সংবিধানের আলোকে আইন সকলের জন্য সমভাবে পরিচালিত হবে। ধনী-দরিদ্র সকলেই ন্যায় বিচার পাওয়ার হকদার। কিন্তু আমাদের দেশে আইনের শাসনের অভাব অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়। তিনি আরো বলেন, আমাদের মনে

বোধ নিয়ে কাজ করতে হবে। তিনি মুহাম্মদ স.-এর উম্মত হিসেবে সকল কর্মকান্ড সততা ও নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করার আহ্বান জানান। তিনি কুরআনের নির্দেশনার আলোকে সমাজে আইনের শাসন ও সমতা প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

লতিফুর রহমান বলেন, ইসলামী নৈতিকতার ভিত্তিতে চরিত্র গড়ে তুলতে হবে। তা না হলে ভালো মানুষ পাওয়া যাবে না। নৈতিকতা বিবর্জিত সমাজ কারো জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। আইনের সাথে নৈতিকতা বোধও থাকতে হবে।

প্রধান অতিথি বলেন, বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন স্বাধীনভাবে বিচার বিভাগ কাজ করার কথা। আমাদের বিচারক, কর্মকর্তা ও অবকাঠামোগত সংকট রয়েছে এগুলো দূর হলে বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা কমে আসবে। তিনি বলেন, বিচারকগণের ন্যায়বিচার করতে হলে তাদের আর্থিক সচ্ছলতা প্রয়োজন। আমি আশা করছি খুব শীঘ্রই বিচারকদের জন্য বেতন কমিশন গঠিত হবে। তিনি বিচার কার্যে সংস্কার ও আধুনিক প্রযুক্তি সংযোজনের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

ড. মাইমুল আহসান খান বলেন, নৈতিকতাকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখা যায়। আসলে নিজেরা ঠিক না হলে কিছু হবে না। আইন ও নৈতিকতার সমন্বয় করতে হবে। তিনি সুবিচার নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম বলেন, আইনের মাধ্যমেই দেশে একদলীয় বাকশালী শাসন কায়েম করা হয়েছিল, আইনের মাধ্যমেই গোয়ান্তানামো বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, আইনের শাসনের নাম করেই যুগে যুগে অপশাসন, গণতন্ত্রের নামে স্বৈরতন্ত্র কায়েম করা হয়েছে। তাই আইনের শাসনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হলে যথার্থ নৈতিকতা সংযুক্ত হতে হবে।

ড. মানজুর ইলাহী বলেন, আইন দিয়েই সবকিছু সমাধান করা যায় না। নৈতিকতারও প্রয়োজন আছে।

ব্যারিস্টার মুন্সী আহসান কবির বলেন, মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই আইন। কিন্তু আইন থাকার পরও প্রয়োগ হয় না কেন? যারা আইন প্রয়োগ করবে, যারা আইন প্রয়োগে সহায়তা করবে তাদের সর্বস্তরেই নৈতিকতা থাকতে হবে। মানুষের বিবেককে কাজে লাগাতে হবে।
স্বাগত বক্তব্যে এডভোকেট নজরুল ইসলাম বলেন, সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য কেবল বিচার ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়। আইন থাকলেই আইনের শাসন আশা করা যায় না। বিচার ও শাসন কার্যে ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখতে নৈতিকতার প্রেরণা অপরিহার্য। সভাপতির বক্তব্যে শাহ আবদুল হান্নান বলেন, আইন ও বিচারের সাথে নৈতিকতা ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি বলেন, নৈতিকতার মূল ভিত্তি ধর্ম; আকাশ, বাতাস কিংবা জঙ্গল নয়। তিনি বলেন, ইসলামী আইন বলতে হাত কাটা, দোররা মারার কথা বলা হয়। এটা ঠিক নয়। অনেক আইন প্রচলিত আছে যার সাথে ইসলামের কোন বিরোধ নেই। তিনি উল্লেখ করেন, ইসলামী সমাজে অমুসলিমরা মানুষ হিসেবে সবার মতো অধিকার ভোগ করে।

–আবু শিফা

ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার

গ্রাহক/এজেন্ট ফরম

আমি 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এর গ্রাহক/এজেন্ট হতে চাই। আমার ঠিকানায় প্রতি সংখ্যা........কপি পাঠানোর অনুরোধ করছি।

নাম ঃ...

ঠিকানা ঃ...

....

বয়স.................... পেশা...

ফোন/মোবাইল ঃ..............................সহজলভ্য মাধ্যম ঃ

ডাক/কুরিয়ার ফরমের সঙ্গে...............................টাকা সংস্থার নামে মানি অর্ডার/টিটি/ডিডি করলাম/অথবা নিম্নলিখিত ব্যাংক একাউন্টে জমা দিলাম।

কথায় টাকা ....

স্বাক্ষর
গ্রাহক/এজেন্ট

ফরমটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে

সম্পাদক
ইসলামী আইন ও বিচার
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার, স্যুট নং-১৩/বি, (লিফ্‌ট-১২), ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০২-৭১৬০৫২৭, ০১৭১৭-২২০৪৯৮, ০১৯১৭-১৯১৩৯৩
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com, www.ilrcbd.com

সংস্থার একাউন্ট নং
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
MSA-8872 ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ পল্টন শাখা, ঢাকা

ভি.পি ও কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়।
ডাক বা কুরিয়ার চার্জ সংস্থা বহন করে।
এজেন্ট হওয়ার জন্য ৫ কপির অর্ধেক মূল্য অগ্রিম পাঠাতে হয়।
গ্রাহক হওয়ার জন্য ন্যূনতম এক বছর তথা ৪ সংখ্যার মূল্য বাবদ-১৬০/- টাকা অগ্রিম পাঠাতে হয়।
৫ কপির কমে এজেন্ট করা হয় না। ৫ কপি থেকে ২০ কপি পর্যন্ত ২০% কমিশন ২০ কপির উর্ধ্বে ৩০% কমিশন দেয়া হয়।
=> ১ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(চার সংখ্যা) = ৪০×৪=১৬০/=
=> ২ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(আট সংখ্যা) = ৪০×৮=৩২০/=
=> ৩ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(বার সংখ্যা) = ৪০×১২=৪৮০/=

REGD. NO. DA. 237(1) ISLAMI AIN O BICHAR : July-September : 2009, TK. 40